অধ্যয়ন ও জ্ঞানসাধনা

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

আবু বকর সিরাজী

সম্পাদনা: আলী হাসান তৈয়ব

2013-1434

IslamHouse.com

فضل العلم وحرص السلف على طلبه

« باللغة البنغالية »

أبو بكر سراجي

مراجعة: علي حسن طيب

2013 - 1434

IslamHouse.com

অধ্যয়ন ও জ্ঞান সাধনা

লেখকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

আল্লাহ তা‘আলার শোকর আদায় ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি দরূদ ও সালাম পাঠ করছি। আল্লাহ তা‘আলা পাঠকদের সঙ্গে এক ধরনের আত্মার বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। সেই বন্ধনের টানে অযোগ্যতা ও শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ক্ষুদ্র উপঢৌকন দিয়ে পাঠকের আতিথেয়তার দুয়ারে উপস্থিত করেন। হয়ত পরম অতিথিপরায়ন আত্মীয় (পাঠকগণ) উপঢৌকনের ক্ষুদ্রতা ও স্বল্পমূল্যতা সত্ত্বেও আমাকে সাদরে বরণ করেন এবং তাদের উদার হৃদয়ে আমাকে স্থান দেন। পাঠকদের এই উদারতাই আমাকে বারবার লিখতে অনুপ্রাণিত করে, সাহস যোগায় মনে। আল্লাহ তা‘আলার করুণা এবং পাঠকগণের উদারতায় আবার তাদের সামনে হাজির হলাম। এবারের আয়োজন আলেম-তালেবে ইলমদের জন্য। ইলমের ফযীলত, আলেমের মর্যাদা, পাঠ ও পঠন পদ্ধতি, শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাপ্রদানে নববী আদর্শ, উস্তাদ-শাগরেদদের সঙ্গে যাপিত আচরণ, ইলম সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জ্ঞানসাধনায় আসলাফ-পূর্বসূরীগণ তথা পূর্বসূরীগণ ত্যাগের যে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আমাদের জন্য পরম আদর্শ

ও অনুসরণীয়। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, আমরা কক্ষচ্যুত হয়েছি। পূর্বসূরীদের সংগ্রামী জীবন থেকে আলাদা করে ফেলেছি।

ফলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং উম্মতে মুসলিমাকে তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছি। মুসলিম জাতির ওপর আজ অন্ধকার মেঘ নেমে এসেছে। জাতীয় মানচিত্র থেকে ইসলাম ও মুসলিমের নাম মুছে ফেলার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। জাতির এহেন ক্রান্তিকালে অনুপ্রেরণা হচ্ছেন আমাদের সংগ্রামী পূর্বসূরীগণ। ইলমী দক্ষতা, যোগ্যতা এবং ইলম অনুযায়ী আমল থাকলে একজন ব্যক্তি জালিমের সামনে কী পরিমাণ সাহসী ও অবিচল থাকতে পারেন- সে ধরনের শিক্ষা আমরা আলোচ্য বই থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

বস্তুত একজন আলেম ও তালেবে ইলমের জীবনের সব আয়োজন এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দেয়ার। তাওফীক দানের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া এবং ভুলত্রুটির জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যোগাযোগ

আবূ বকর সিরাজী

সম্পাদক, জীবনপাথেয়

ফোন ০১৭৩৬৬১৬৫৯০/০১৯১৩৭৭৪৪২৯

সম্পাদকের কথা

মুক্তবাসিনী নামের জনপ্রিয় বইয়ের পর ইসলাম হাউজে লেখকের তৃতীয় বই এটি। সংকলক বইটি প্রণয়ন করেছেন মূলত মাকতাবা

শামেলার ‘হামালাতুল উলুমিশ শারঈ’ তথা শরঈ ইলমের বাহক-সাধকেরা শীর্ষক ক্যাটাগরিতে প্রযুক্ত কিতাবাদির আলোকে। মূলগ্রন্থের অধিকাংশই প্রাচীনধারার মূল্যবান গ্রন্থতালিকার অন্তর্ভুক্ত। সেসব বইয়ের অনেক উদ্ধৃতিই সে যুগে সঙ্গত কারণেই যথাযথভাবে যাচাই করার সুযোগ হয়নি। বর্তমানে ইলমী গবেষণা সহজ হওয়ায় বিশেষত মাকতাবা শামেলার মতো অপূর্ব নেয়ামত হাতের নাগালে চলে আসায় সেসবের তাখরীজ-তাহকীক তথা হাদীছের হুকুম ও টিকা সংযোজন সহজতর হয়েছে।

সম্পাদনাকালে পুরো বইয়ের হাদীছ যাচাই করা হয়েছে এবং মওযু তথা জাল হাদীছ বাদ দেওয়া হয়েছে। অল্প কিছু যঈফ হাদীছও বিয়োজন করা হয়েছে। অবশিষ্ট যেসব হাদীছ যঈফ রয়েছে, সেগুলোতে উদ্ধৃতির পর বন্ধনীর মধ্যে যঈফ লিখে দেওয়া হয়েছে।

হাদীছ ছাড়া অন্যসব উদ্ধৃতি যেমন পূর্বসূরীদের বাণী, বক্তব্য বা আমল ইত্যাদির ক্ষেত্রে রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়নি, কেবল কার বাণী তা উল্লেখ করা হয়েছে। এমন করা হয়েছে পাঠকের বিরক্তি এড়াতে এবং বইটিকে তথ্যভারাক্রান্ত না করে সুখপাঠ্য বানাতে। সচেতন পাঠকের যে কেউ চাইলে আরবী ভাষায় মাকতাবা শামেলায় সার্চ দিয়ে সেসব উদ্ধৃতি খুঁজে বের করতে পারবেন।

আশা করি বইটি প্রযুক্তির একাধিপত্যের এ যুগে বইবিমুখ প্রজন্মকে বই ও পাঠমুখী করবে। আল্লাহ লেখকের প্রয়াস কবুল করুন এবং

তাকে আরও উন্নত এবং আরও উপকারী গ্রন্থাদি বেশি বেশি রচনার তাওফীক দান করুন। আমীন

বিনীত

সম্পাদক, ২৫/০২/২০১৪ ঈসাব্দ

ইলমের সংজ্ঞা

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

العلم بالكسر وسكون اللام: في عرف العلماء يطلق على معان منها، الإدراك مطلقا

ইলম শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এগুলোর একটি অর্থ হচ্ছে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা। দার্শনিকগণ এই অর্থের প্রবক্তা।

কেউ কেউ বলেন,

ومنها التصديق مطلقا، يقينيا كان أو غيره والعلم بمعنى اليقين في اللغة

‘ইলমের অর্থ সত্যায়ন করা। চাই তা ইয়াকিনী হোক বা অন্য কিছু। আর অভিধান অনুযায়ী ইলম অর্থ ইয়াকিন বা বিশ্বাস।’

এর এক অর্থ হচ্ছে التعقل বা আকলের সাহায্যে অনুধাবন করা। আর এই অর্থের ভিত্তিতেই ইলম শব্দটি কল্পনা, ধারণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইলমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে:

إدراك المسائل عن دليل

তথা দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা আয়ত্ব করা।

বস্তুত: ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা অনন্য গুণাবলিসমূহের একটি, যা ইলমের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীগণ এর অন্তর্নিহিত একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেই সংজ্ঞায় ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ইলমের আলামত ফুটে ওঠে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন,

ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله

'বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের নাম।'

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন,

الحكمة والعمل نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ، ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلي دار الخلود

'হেকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর। যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান। আর বেশি বেশি মাসআলা জানার নাম ইলম নয়। এর একটি আলামত আছে। তা হচ্ছে, ইলমের বদৌলতে প্রতারণার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে ধাবিত হওয়া।'

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للآجل

'ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা।'

মুমিন হতে হলে ইলম জরুরী

অনেকের ধারণা, ইলমের বিষয়টি কেবল ফযীলতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইলম হাসিল করা ভালো এবং সওয়াবের কাজ আর না করা দোষণীয় নয় তবে ছাওয়াব ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর মাত্র। কিন্তু বিষয়টি কি আদৌ এমন? ফযীলতের মধ্যেই কি ইলম সীমাবদ্ধ? মোটেই তা নয়। বরং একজন মানুষের প্রকৃত মুমিন হওয়া নির্ভর করে ইলম হাসিলের ওপর। কারণ কোনো ব্যক্তি ইলম হাসিল করা ছাড়া প্রকৃতি মুমিনই হতে পারে না। কেননা মুমিন হওয়া নির্ভর করে দুটি বস্তুর ওপর। এক. সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। দুই. শরীয়ত নির্দেশিতপন্থা ছাড়া ইবাদত করবে না। আর এ দুটিই হচ্ছে তাওহীদের মর্মবাণী। যথা:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

সুতরাং তাওহীদের মর্মবাণীর মধ্যে ইলম অপরিহার্যভাবে জড়িত ও পরিব্যপ্ত। অতএব বোঝা গেল, ইলম ছাড়া তাওহীদের মর্মবাণী যথার্থভাবে উপলব্ধি হয়নি। একারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে ইলমকে আমলের আগে প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন এবং একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন নিম্নোক্ত শিরোনামে-

بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ االْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

‘এ অধ্যায় কথা ও কাজের আগে ইলম- এ বিষয়ে। যেমন আল্লাহও বলেছেন, ‘তোমরা জানো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই’।

ইলম: বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম উপহার

আল্লাহ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টি করার তাদেরকে বিভিন্ন রকমের নেয়ামত দান করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ও দান এত বিস্তৃত ও সীমাহীন যে, কারো পক্ষে সে সব নেয়ামতের হিসাব করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোনো কোনো নেয়ামত এত মূল্যবান যে, যা হাজার নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাও ওই সব নেয়ামতের কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। বান্দার প্রতি আল্লাহ তা‘আলার অমূল্য নেয়ামতরাজির অন্যতম হচ্ছে ইলম।

ইলম শুধু মহা নেয়ামতই নয়; বরং বান্দার প্রতি আল্লাহ তা‘আলার প্রথম উপহার, যা তিনি বান্দা তথা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাকে দান করেছিলেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করার আগে ফেরেশতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তারা নেতিবাচক পরামর্শ দেন। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এর জবাবে বলেন,

﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ ﴾ [البقرة: ٣٠]

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’, তারা বলল,

‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩০}

এরপর তিনি আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। তাকে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম ইলম শিক্ষা দেন এবং ইলমকেই ফেরেশতাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করেন। যেমন পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ ﴾ [البقرة: ٣١]

‘আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতপর বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩১}

মোটকথা, আল্লাহ তখন মানুষ সৃষ্টিতে দ্বিমতকারী ফেরেশতাদের সামনে কিছু বিষয় পেশ করেন যার জবাব দিতে তারা ব্যর্থ হন এবং তখন আদম (আ.)-কে সেগুলোর জবাব দিতে বলেন। যেসব বিষয়ে ফেরেশতারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন সেগুলো আদম (আ.) প্রকাশ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল্লাহ তা‘আলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে ইলমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং ইলম

গ্রহণকারী মানুষকে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সুতরাং বুঝা গেল, নিষ্পাপ ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো ইলম- আল্লাহ তা'আলা যা মানুষকে প্রথম উপহার হিসেবে দান করেছেন।

ইলম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শুধু উপহারই নয়; বরং অসামান্য অনুগ্রহও বটে। তিনি কুরআনের বহু স্থানে বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ বিশেষ দান-অনুগ্রহের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আর যে দান ও অনুগ্রহ সবিশেষ মূল্যবান সেটি হচ্ছে ইলম। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ۝٣ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ ۝٤ ﴾ [الرحمن: ٣، ٤]

'মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন।' {সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৩-৪}

ইলম ও আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

সাধারণ মুমিনের চেয়ে আলেমের মর্যাদা বহু গুণ বেশি: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ۝١١ ﴾ [المجادلة: ١١]

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।' {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ১১}

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'সাধারণ মুমিনের চেয়ে আলেমের মর্যাদা সাতশত গুণ বেশি। এবং প্রতিটি মর্যাদার মধ্যে দূরত্ব পাঁচশত বছরের সমান।'

আলেমের নাম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে!

আল্লাহ আলেমদেরকে কী পরিমাণ মর্যাদা দান করেছেন তার বড় প্রমাণ তিনি নিজের নামের সঙ্গে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেন-

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ ﴾ [ال عمران: ١٨]

আলেমগণকে তাঁর নিজের নামের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কেননা যে যাকে ভালোবাসেন তিনি তাকে নিজের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করেন। একারণেই আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কেরামের নাম নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন এবং এর কারণ হচ্ছে; মানুষের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশি সম্মানিত ও প্রিয়। ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাফসীরে লেখেন-

وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم ، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء

'আলোচ্য আয়াত ইলম ও ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দলিল। কেননা ওলামায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ তা'আলার

কাছে অধিক সম্মানিত হলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে তাদের নামই উল্লেখ করতেন।’

আলেমদের এই সম্মান ও মর্যাদার কারণ হচ্ছে, একমাত্র তারাই যথাযথভাবে এবং হক অনুযায়ী আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করেন ও তার বিধান সহীহ তরীকায় পালন করতে সচেষ্ট থাকেন। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٨ ﴾ [فاطر: ٢٨]

“কেবলমাত্র আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।” [সূরা ফাতির: ২৮]

এমনিভাবে নবুওয়াতের সাক্ষীদাতা হিসেবে আলেমরাই যথেষ্ট বলে কুরআনে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسۡتَ مُرۡسَلٗاۚ قُلۡ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَۢا بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡ وَمَنۡ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡكِتَٰبِ ٤٣ ﴾ [الرعد: ٤٣]

“আর কাফিররা বলে, আপনি প্রেরিত রাসূল নন, বলুন, আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, আর যার কাছে রয়েছে কিতাবের জ্ঞান”। [সূরা আর-রা‘দ:৪৩]

ইলমের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা এক অবিশ্বাস্য শক্তি সন্নিহিত করেছেন। বিষয়টি অনুধাবন করা যায় সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে রাণী বিলকিসের সিংহাসন উপস্থিত করার ঘটনায়। নবী সুলায়মান (আ.) তখন শামে অবস্থান করছিলেন। আর বিলকিসের রাজত্ব ও

সিংহাসন ছিল ইয়ামানে অবস্থিত। তিনি সেখান থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলকিসের সিংহাসন আনার আগ্রহ প্রকাশ করলে ইফরিত জিন্ন মজলিস থেকে ওঠে পুনরায় ফিরে আসার সময়ের মধ্যে তা হাজির করার সামর্থের কথা জানায়। কিন্তু এই প্রস্তাব সুলায়মান (আ.)-এর মনোপুত হলো না। কেননা এরচেয়েও কম সময়ের মধ্যে তিনি সিংহাসন নিজের সামনে উপস্থিত দেখতে চাচ্ছিলেন। তখন দরবারে যে ব্যক্তি আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিলেন তিনি বললেন-

﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلۡمٌ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ ﴾ [النمل: ٤٠]

‘আর যার কাছে কিতাবের ইলম ছিল, সে বলল, আমি এরচেয়েও কম সময়ে- চোখের পলক পড়ার আগেই আপনার সামনে তা উপস্থিত করতে পারি।’ {সূরা আন-নামল, আয়াত: ৪০}

এই বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ইলমের বরকতে এবং ইলমের কল্যাণে। ওই ব্যক্তি ইলমের শক্তিবলে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে সিংহাসন উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব, আখেরাতের অবশ্যম্ভাবিতা এবং করণীয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত বলে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাই তাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কারূনের সীমাহীন ধন-সম্পদ দেখে সাধারণ মানুষের চোখ যখন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল এবং সবাই এই পাপীর মতো সম্পদের প্রাচুর্য্য কামনা করছিল তখন বিচক্ষণ

আলেমগণ নিজেদেরকে এই ঘৃণিত কামনা থেকে বিরত রাখলেনই, সেই সঙ্গে সাধারণ লোকদের এই কামনাকে চরম ধিকৃত বলে প্রকাশ করলেন। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗاۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ٨٠ ﴾ [القصص: ٨٠]

'আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, 'ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা শুধু সবরকারীরাই পেতে পারে।' {সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮০}

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিব্যবস্থা, তাঁর কুদরত ও কার্যাবলির হেকমত কারো পক্ষে অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি যেমন মহান তাঁর যাবতীয় কার্যও মহান এবং সূক্ষ্ম ও হেকমতপূর্ণ। তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে যা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তবে আলেমগণকে আল্লাহ তা'আলা তার কর্মকাণ্ডের যৎকিঞ্চিত হেকমত ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ ٤٣ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]

'আমি এসব উপমা উপস্থাপন করি। তবে আলেমগণ ছাড়া অন্য কেউ তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।' {সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৩}

জীবন চলার পথে, সামাজিক নানা সমস্যা ও বিপদাপদে সাধারণ মানুষকে আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং ওলামায়ে কেরামকে সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থলের মর্যাদা দান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ ﴾ [النحل: ٤٣]

‘সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৩}

একমাত্র ওলামায়ে কেরামই যুগসমস্যার সমাধান এবং ইসলামের প্রকৃত ও যথার্থ দিকনির্দেশনা করতে পারেন বলে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন। মানুষের অজ্ঞাত ও অবোধ্য বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ইলমের প্রতিনিধি উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣ ﴾ [النساء: ٨٣]

‘আর যদি তারা সেটি রাসূলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে অবশ্যই অল্প

কয়েকজন ছাড়া তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮৩}

মুফাসসিরগণ লিখেছেন-

وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله

'বস্তুত এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিধান নির্গত করার দিক দিয়ে ওলামায়ে কেরামকে নবীগণের মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।'

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (রহ.) কুরআনে বর্ণিত তাদের ফযীলতের কথা উল্লেখ করে আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করেন-

وأن من استدل على حكمه واستنبط معناه فحمله على المحكم المتفق على معناه فهو ممدوح مأجور ممن قال الله تعالى (لعلمه الذين يستنبطونه منهم)

'যেসব লোক হুকুম আহকামের ব্যাপারে গবেষণা করে এবং সঠিক অর্থ প্রকাশ করে অতপর তা সঠিক অর্থে প্রয়োগ করে সে প্রশংসিত এবং প্রতিদানযোগ্য। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারেই এই আয়াতটি ইরশাদ করেছেন।

তিনি ওলামায়ে কেরামকে জাতির দিকনির্দেশক ও পথপ্রদর্শক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'যেহেতু ওলামায়ে কেরামই আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ভালোভাবে জানেন তাই কওমের লোকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের আদেশ মান্য করা এবং তাদের অনুসরণ করা।'

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিরন্তন উৎস আল-কুরআনের বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার আলেমদের সিনায় সংরক্ষিত বলে কুরআনে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]

'বরং এটি হচ্ছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, যা যাদেরকে ইলমের অধিকারী করা হয়েছে তাদের বক্ষে সংরক্ষিত।' {সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৯}

কুরআনের ইলম আলোকবিচ্ছরণকারী নূর

﴿ وَلَقَدۡ جِئۡنَٰهُم بِكِتَٰبٖ فَصَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ عِلۡمٍ هُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٥٢ ﴾ [الاعراف: ٥٢]

'আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে।' {সূরা আল-'আরাফ, আয়াত: ৫২}

আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ আমিন শানকিতী (রহ.) বলেন,

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي

‘সন্দেহ নেই যে, এই কুরআনই হচ্ছে সেই নূর, যা আল্লাহ তা‘আলা ভূপৃষ্ঠকে আলোকময় করতে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সেই আলোর সাহায্যে হক ও বাতিল এবং ভালো ও মন্দ পার্থক্য করা যায়। ক্ষতি ও উপকারী বস্তু চেনা যায়। ভ্রান্তি থেকে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়।’

ইলমকে আল্লাহ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ লেবাস বলে অভিহিত করেছেন। যথা-

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦ ﴾ [الاعراف: ٢٦]

‘হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ২৬}

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে লিবাস দ্বারা ইলম, রী-শা দ্বারা ইয়াকিন এবং লিবাসুত তাকওয়া দ্বারা লজ্জাশীলতা উদ্দেশ্য।

এসব আয়াত ছাড়াও আরো বহু আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইলম ও ইলমের বাহকদের প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে মূর্খতা ও ইলমহীনতার নিন্দাও করেছেন কুরআনের বহু জায়গায়।

মূর্খতার নিন্দা

মূর্খতা হচ্ছে আত্মার মৃত্যু এবং জীবন যবেহ ও হায়াত ধ্বংস করার নাম। কুরআনে মূর্খতা থেকে বেঁচে থাকতে এবং এর নিন্দা জ্ঞাপন করে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٤٦ ﴾ [هود: ٤٦]

'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' {সূরা হূদ, আয়াত: ৪৬}

শুধু তাই নয়; অন্য আয়াতে মূর্খতাকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন-

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٖ مِّنۡهَاۚ ﴾ [الانعام: ١٢٢]

'যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মত যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না?' {সূরা আল-'আনআম, আয়াত: ১২২}

পক্ষান্তরে ইলমকে বুদ্ধিমান লোকদের অন্তর্দৃষ্টিতা এবং প্রাণসঞ্জীবিনী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে ইলম দ্বারা মৃতের জীবন সঞ্চার হয় এবং মানুষের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি

ইলম রাখে না সে অন্ধকারে চলমান ব্যক্তির মতো, যে কখনই ওই অন্ধকার থেকে নিস্তার পায় না।

বাহ্যিকদৃষ্টিতে মানুষ একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করেই থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বান্দাকে আকৃষ্ট করেছেন যে, মানুষের সঙ্গে চলাফেরা এবং সামাজিকতা রক্ষা করার জন্য ইলম চাই। কুরআনী ইলম ছাড়া যত বড় শিক্ষা ও শিক্ষাবিদ থাকুক না কেন, কুরআন-হাদীছ ও ইসলামের পরিভাষায় তা মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইলম ও আখেরাতবিহীন জ্ঞান ও জ্ঞানের অধিকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মূর্খতার উপাধি পাওয়ার পর এদেরকে জ্ঞানী হিসেবে জাহির করা কতটুকু সঠিক?

কুরআনের এক আয়াতে যাদের কুরআনের জ্ঞান নেই তাদেরকে যাদের কুরআনের জ্ঞান আছে তাদের সঙ্গে তুলনা করতে বারণ করা হয়েছে এবং তারা পরস্পরে মর্যাদার দিক দিয়ে কখনই এক নয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। যথা-

﴿ ۞أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ أَعۡمَىٰٓۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩ ﴾ [الرعد: ١٩]

'যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।' {সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ১৯}

সুতরাং যারা পার্থিব জীবনের জ্ঞান ও ধন-সম্পদ নিয়ে অহমিকা করে তাদের বাহ্যিক সুখদর্শনে কারো বিভ্রান্ত ও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ওরা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো, যারা চারণভূমিতে পেটে যতদূর জায়গা হয় ততদূর খেয়ে থাকে। আর বাড়িতে যাওয়ার পর জায়গা হয় নোংরা গোয়াল ঘর কিংবা নিকৃষ্ট খোয়াড়ে। কিন্তু একজন মানুষ কি তাই? সে কি গরুর প্রচুর খাওয়া দেখে হিংসা বা ঈর্ষা করতে পারে? না মানায় তা?

অতএব মর্যাদা, গৌরব, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের কিছু থাকলে তা ইলমের মধ্যেই নিহিত এবং যারা ইলম ধারণ করেছে তারা বাহ্যিকদৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, গরীব ও অসহায় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারাই সফল, বিত্তবান এবং মর্যাদার অধিকারী।

ইলমের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের জাগতিক সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। দুনিয়ার যাবতীয় আসবাব-সম্পদ মৃতের জন্য অর্থহীন ও অকার্যকর প্রমাণিত হয়ে যায়। এমনকি জীবদ্দশার কৃত যাবতীয় ইবাদতের ছাওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইলম এমন এক ইবাদত, যার ধারাবাহিকতা কখনও শেষ হয় না। যেমন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ছাড়া তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমল তিনটি হচ্ছে চলমান সাদাকা, এমন ইলম, যা দ্বারা (অন্যরা) উপকৃত হয় তথা ইলমে নাফে‘ এবং নেক সন্তান, যে মৃতের জন্য দু‘আ করে।’ [মুসলিম: ১৬৩১]

একজন আলেমের প্রচার-প্রসারকৃত ইলম কেয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় যুক্ত হওয়ার কথা অন্য হাদীছে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মৃত্যুর পর মুমিনের সঙ্গে যেসব আমল যুক্ত হবে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে ইলম, যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং যার প্রচার-প্রসার করেছে; পুণ্যবান সন্তান যে সে রেখে গিয়েছে; কুরআন যার সে উত্তরাধিকারী বানিয়েছে; মসজিদ যা সে বানিয়েছে; মুসাফিরদের আশ্রয়কেন্দ্র যা সে নির্মাণ করেছে; নদী যা সে খনন করেছে এবং সাদাকা যে সে নিজ জীবদ্দশায় ও সুস্থতাকালে আপন সম্পদ থেকে দান করেছে- এসব তার মৃত্যুর

পর তার সঙ্গে যুক্ত হবে।' [ইবন মাজাহ্: ২৪২; সহীহ ইবন খুযাইমা: ২৪৯০, শায়খ আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন]

ইলমের পথকে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান, দামি ও জান্নাতের পথ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ »

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (দীর্ঘ হাদীছের অংশ) 'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' [মুসলিম: ২৬৯৯]

কুরআন ও ইলমের মজলিসকে আল্লাহ তা'আলার রহমত অবতীর্ণ হওয়ার কেন্দ্র বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। এ হাদীছেরই পরের অংশে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

'আল্লাহর যে ঘরে মানুষ একত্রিত হয় এবং তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে ইলমের দরসে লিপ্ত হয় সেই ঘরে রহমত অবতীর্ণ হয়, ফেরেশতারা সেই ঘরকে বেষ্টন করে নেন এবং আল্লাহ

তা‘আলা তাঁর আশেপাশে যারা আছেন (ফেরেশতারা) তাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন। [মুসলিম: ২৬৯৯]

পৃথিবীর এমন কে আছে, যাদের পায়ের নিচে ফেরেশতাদের মতো মহাসম্মানিত ও নিষ্পাপ মাখলুক নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন? হ্যাঁ, মহাসম্মানিত এই বান্দাগণ একমাত্র ইলমের বাহক ওলামায়ে কেরাম এবং তালেবে ইলমের পায়ের নিচে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। শুধু কি তাই? দিগন্তবিস্তৃত প্রাণীকুল, আসমানের ফেরেশতা, সমুদ্রের মাছ, গর্তের পিপিলিকা, ভূপৃষ্ঠে চলমান প্রতিটি প্রাণীই আলেম এবং তালেবে ইলমের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করতে থাকে! এই বিরল সম্মান কীসের ফসল? ইলমের ফসল। যেমন:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ، مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ »

‘কাছীর ইবন কায়স থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দামেশকের মসজিদে আমি আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে বসা ছিলাম। তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি আগমন করে বললেন, হে আবূদ্দারদা! আমি মদীনা শহর থেকে আপনার কাছে এসেছি একথা জেনে যে, আপনি

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন। আমি অন্য কোনো প্রয়োজনে আসিনি, কেবল সেই হাদীছটি শ্রবণ করতে এসেছি। আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তুমি ব্যবসায়ীক বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আগমন করনি? একমাত্র একারণেই তুমি সফর করে এসেছ? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। একমাত্র একারণেই এখানে এসেছি। তখন তিনি বললেন, তবে শুনে রেখো, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হয় আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতারা তার সম্মানে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়। আলেমের জন্য আসমান-জমিনের সবাই দু‘আ করতে থাকে। এমনকি সাগর ও খাল-বিলের মাছও তার জন্য দু‘আ করতে থাকে...। [ইবন মাজাহ: ২২৩; সহীহ]

জগদ্বাসীর চন্দ্র ও আসমানবাসীর চন্দ্র

রাতের সৌন্দর্য কোন্ বস্তুতে নিহিত? কাব্য-কবিতায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় কোন্ বস্তু বেশি ব্যবহৃত হয়? পূর্ণিমার চাঁদ এবং চাঁদের আলো! কবি-গল্পকারদের কবিতা ও গল্প যেন চাঁদের রশ্মি ছাড়া আলোই ছড়ায় না! পূর্ণিমার রাতের স্নিগ্ধ আলোর মোহনীয় দৃশ্য মানসপটে গভীর প্রভাব ফেলে না- এমন লোকের অস্তিত্ব বোধ হয় সারাবিশ্বে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছোটো-বড় সকলের কাছে চাঁদ এবং চাঁদের আলো প্রিয় এবং উপমাযোগ্য। জগদ্বাসীর কাছে যদি চাঁদ এবং চাঁদের কদর এত থাকে, তবে আসমানবাসী এবং

স্বয়ং আসমান-জমিনের অধিপতির কাছে চাঁদের আলোর চেয়েও আকর্ষণীয় বস্তু আছে। তা হচ্ছে ইলম এবং ইলমধারী ওলামায়ে কেরাম। হাদীছের পরের অংশে সে কথাই বলা হয়েছে:

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

'আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা তেমন, যেমন নক্ষত্ররাজির ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা।' [ইবন মাজাহ: প্রাগুক্ত]

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকার

মানুষ পরবর্তীদের জন্য সম্পদ জমা করে যায়, ওয়ারিস হিসেবে রেখে যায়, পরবর্তীরা পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করে ধন্য হয়, গৌরববোধ করে। কেউ বংশীয় সূত্রে জমিদারী পায়, কেউ পায় সিংহাসন, কেউ পায় পদ-পদবী এবং কেউবা অঢেল সম্পদ। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে এগুলোর কী-ইবা মূল্য আছে! বিশ্বের সব মানুষের কাছে এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মহা নেয়ামত এবং মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে নবুওয়াত। এই নেয়ামত যোগ্যতা বলে কিংবা হাজারও প্রচেষ্টায় হাসিল করা সম্ভব নয়। তা নেহায়তই আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও দান। তিনি লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে থেকে মাত্র এক লাখ চব্বিশ হাজার মানুষকে এই মহান নেয়ামতের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মধ্য দিয়ে চির গৌরবের এই নেয়ামত লাভের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সবিশেষ করুণা এই যে, এই ধারা বন্ধ হয়ে গেলেও এর রহমতের

ছায়া সচল রয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত একশ্রেণীর মানুষকে তিনি নবুওয়াতের রহমতের ছায়ায় আশ্রিত করবেন। আশ্রিতরা হবেন ওলামায়ে কেরাম এবং রহমতের ছায়াটি হচ্ছে ইলম। পৃথিবীতে এরচেয়ে শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার এবং শ্রেষ্ঠ ছায়া দ্বিতীয়টি নেই। যেমন একই হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে,

وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

'আলেমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিছ। আর নবীগণ ধনসম্পদের মীরাছ রেখে যান না, বরং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ইলমের মীরাছ রেখে যান। সুতরাং যে ব্যক্তি এই মহামূল্যবান মীরাছ গ্রহণ করল সে বিরাট মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করল।' [ইবন মাজাহ: প্রাগুক্ত]

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছেন প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আর আলেমদের করেছেন সাধারণ আবেদের তুলনায় রাসূলের মতো মহামান্বিত। যেমন:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ»

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুইজন ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হলো। একজন আবেদ আর অপরজন আলেম। জবাবে তিনি বললেন, ওই দুইজনের মধ্যে আলেমের মর্যাদা তেমন সুউচ্চ, যেমন আমার মর্যাদা একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে সুউচ্চ। এরপর তিনি বললেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আলেমের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতা, আসমান ও জমিনবাসী, এমনকি গর্তের পিপিলিকা এবং সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' [তিরমিযী: ২৬৮৫]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমকে নেতৃত্ব ও মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا»

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার মানুষ তোমাদের অনুসারী। আর তোমাদের কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা আসবে দীন শেখার জন্য। সুতরাং তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।' [তিরমিযী: ২৬৫০][1]

---

[1]. আলবানী যঈফ বলেছেন।

ইলম জগতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ

মানুষ আজ সারাবিশ্বে জুড়ে খনিজ সম্পদ ও অর্থকড়ির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সম্পদ ও মূল্যবান বস্তু আসলে কোনটি? স্থূলদৃষ্টির মানুষের সংজ্ঞায় তা সংজ্ঞায়িত না করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে এর সংজ্ঞা দেওয়া যাক। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَلِمَةُ الْحَكِيمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيمِ حَيْثُ مَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

'হেকমত ও ইলমের একটি কথা জ্ঞানীর জন্য হারানো মূল্যবান সম্পদের মতো। সুতরাং যেখানে পায় সেখান থেকেই যেন সে তা সংগ্রহ করে নেয়।' [বাইহাকী: ৪১২, যঈফ]

নারী-পুরুষ সকলেই ইলম অন্বেষণে আদিষ্ট

ইলমের এই মর্যাদা লাভের জন্য শুধু পুরুষরাই নয় বরং নারীরাও আদিষ্ট। সকলের জন্য এই মর্যাদা এবং সকলের জন্য তা অপরিহার্য। যেমন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ »

'আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইলম অন্বেষণ করা

প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরয।’ [ইবন মাজাহ: ২২৪, সহীহ] হাদীছের ব্যাখ্যাকারীগণ লিখেছেন,

وبلا ريب لفظ (مسلم) يدخل فيه أيضا (المسلمة). أما الحديث الذي فيه زيادة (ومسلمة) فهي زيادة ضعيفة، وعموم اللفظ الأول يغني عن الضعيف

‘নিঃসন্দেহে মুসলিম مسلم (পুরুষ) শব্দটি المسلمة মুসলিমা (নারী) কেও শামিল করে। অর্থাৎ এই বিধান পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর জন্য সমানহারে প্রযোজ্য। আর কোনো কোনো হাদীছে المسلمة শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এটি দুর্বল তথা অপ্রয়োজনীয় সংযোজন। কেননা ‘মুসলিম’ শব্দটিই এটার প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেয়।’

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসাফির

আল্লাহ তা‘আলার নিকট জিহাদ অত্যন্ত প্রিয় আমল। জিহাদের রাস্তার ধূলোবালিকে তিনি জাহান্নামের প্রতিবন্ধক বানিয়েছেন এবং এই পথের পথিককে দিয়েছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকের মর্যাদা। এই রাস্তার মুসাফিরের ধূলোবালি আর জাহান্নামের আগুন একত্রিত হওয়াকে তিনি হারাম করেছেন। ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও তিনি সেই মর্যাদাই দিয়েছেন এবং ইলম অন্বেষী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে না ফেরে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জিহাদের রাস্তায় থাকারই ছাওয়াব দান করেন। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ»

'আনাছ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হয় সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে, যাবত না সে ফিরে আসে।' [জামে তিরমিযী: ২৬৪৭[2]]

মানুষ অন্যকে কোনো সাফল্য পেতে দেখলে আফসোস করে, ঈর্ষা করে, হিংসা করে এবং নিজে সে সব সাফল্য পেতে চায়, মনেপ্রাণে তা কামনা করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে হিংসা ও লোভ-লালসা নিষিদ্ধ এবং তা কঠোর গুনাহের কাজ। কিন্তু ইলম এমন এক মূল্যবান সম্পদ, যা অন্যকে হাসিল করতে দেখলে শুধু আফসোস করা নয়, বরং তা লাভের জন্য রীতিমতো ঈর্ষা করাও জায়েয! সহীহ বুখারী ও মুসলিমে যেমন বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা বৈধ নয়। এক. ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা হকের পথে ব্যয় করে এবং দুই. ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন, যা দ্বারা সে বিচারকার্য

---

[2]. শায়খ আলবানী যঈফ বলেছেন।

পরিচালনা করে এবং এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।’ [বুখারী: ৭১৪১; মুসলিম: ৮৫০]

ইলমের সামগ্রিক চিত্র ও হাকীকত

মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর এক হাদীছে ইলমের একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র ও ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন,

«تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يُقْتَصُّ آثَارُهُمْ، وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ، تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلَّتِهِمْ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامَ، بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ، وَهُوَ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ» ، هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ

‘তোমরা ইলম শিক্ষা করো, কেননা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম তলব করা আল্লাহভীতি এবং ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইলমের আলোচনা করা তাসবীহ এবং বাহাছ করা জিহাদের মতো। অজ্ঞকে

শিক্ষা দেওয়া দান-সদকার মতো। যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করা নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা ইলম হচ্ছে হালাল-হারামের মাপকাঠি। জান্নাতীদের পথের আলো। ইলম একাকিত্বের সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার বন্ধু, নির্জনতায় গল্পের সঙ্গী। সুখ-দুঃখের দলিল। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র, বন্ধু-বান্ধবদের সামনে অলঙ্কার। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে একদল লোককে সম্মানিত করেন, ফলে তারা সমাজের নেতৃত্ব লাভ করে। তারা পথপ্রদর্শক হয়, যেই পথ অনুসরণ করে সাধারণ মানুষ পথ চলে। ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের আলোচনা করা হয় এবং ফেরেশতাগণ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের পায়ের নিচে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। জীব-জড় এবং জলভাগ-স্থলভাগ সবশ্রেণীর মাখলুক ইলমওয়ালার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেন। এমনকি সমুদ্রের মাছ এবং ভূমির কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু-দানব! কেননা ইলম হচ্ছে মূর্খতা থেকে জীবন সঞ্চারণকারী। গভীর অন্ধকারের প্রখর উজ্জ্বল বাতি। ইলম বান্দাকে দুনিয়া-আখেরাতে মর্যাদার উচ্চ আসনে নিয়ে যায়। ইলম বিষয়ে ফিকির করা সাওম পালনের মতো। ইলমের দরস দেওয়া রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায় করার মতো। ইলমের দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এর দ্বারাই হালাল-হারামের সুস্পষ্ট জ্ঞান হাসিল হয়। ইলম হচ্ছে ইমাম এবং আমল হলো তার মুক্তাদী। ভাগ্যবানরা ইলম লাভে ধন্য হয় আর হতভাগ্যরা এ থেকে বঞ্চিত হয়।' [ইবন আবদুল বার (রহ.), জামে বয়ানুল ইলম, বর্ণনা নং ২৬৪]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটেছিল একজন মুআল্লিম হিসেবে। তিনি ইরশাদ করেন-

« وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا»

'আমি তো একজন শিক্ষক হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছি।' [ইবন মাজাহ: ২২৯[3]]

ইলম অন্বেষণ অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে ফযীলতপূর্ণ

ইলম হাসিলের কাজে লিপ্ত থাকা নফল ইবাদতে মশগুল থাকার চেয়ে বেশি মর্যাদার। কেননা ইলম মানুষকে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পন্থা শেখায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ. وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ» .

'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ

---

[3]. হাদীছের সূত্র যঈফ তথা দুর্বল। তবে অর্থগত দিক থেকে এটি সহীহ। কেননা পবিত্র কুরআনে শিক্ষা দান করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

করেন, যে ব্যক্তি ইলম তলবের পথ গ্রহণ করে আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিই। আর আমি যার উভয় চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেই, তাকে উভয়ের বদলা দেব জান্নাতে। ইলম অন্বেষণের ফযীলত ইবাদতে লিপ্ত থাকার ফযীলতের চেয়ে বেশি। আর দীনের মূল হচ্ছে আল্লাহভীতি। [বায়হাকী: ৫৩৬৭, সহীহ]

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অভিব্যক্তি

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه

'একজন আলেম রোজাদার, তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রি জাগরণকারী এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের চেয়ে উত্তম। যখন একজন আলেম মারা যান যখন ইসলামের গায়ে একটি ছিদ্র ও দাগ পড়ে। যা অপরজন তার স্থান পূরণ না করার আগ পর্যন্ত ভরাট হয় না।' তিনি আরো বলেন,

العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يُكسِبُ العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزّان المال وهم أحياء

'ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর তুমি পাহারা দাও সম্পদকে। আলেম ব্যক্তির জীবনে ইলম নিয়ে আসে মানুষের আনুগত্য, আর মৃত্যুর পর তাকে সবাই উত্তমভাবে

স্মরণ করে। আর মালের মালিক মারা গেলে মালও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং, মালের মালিকরা জীবিত হলেও মৃত থেকে যায়।’

ইলম হাসিল হলে দুনিয়ার সব কিছু হাসিল হয়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

خُيِّرَ سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه

‘সুলায়মান ইবন দাঊদ ‘আলাইহিমাসসালামকে ইলম, সম্পদ ও রাজত্ব- এই তিনটি বস্তুর যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইলম এখতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু এর বদৌলতে সম্পদ ও রাজত্বও হাসিল হয়েছিল।’

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আহমাদ (রহ.) বলতেন,

تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها

‘রাতের কিছু অংশে ইলমের আলোচনা করা আমার কাছে সারারাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার চেয়েও প্রিয়।’

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت

‘হে লোক সকল! তোমরা ইলম গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তা‘আলার একটি চাদর আছে, যা তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি ইলমের কোনো দরজা অন্বেষণ করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিজ চাদরে আশ্রয় দেন। যদি সে কোনো গুনাহ করে, তাকে তিনবার এর শাস্তি থেকে সতর্ক করে যেন তার থেকে নিজ চাদর ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। যদিও এ গুনাহ আমৃত্যু দীর্ঘায়িত হয়।’

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

ذللت طالبا فعززت مطلوبا

‘ইলম অন্বেষণের সময় তুচ্ছ থেকেছি ফলে উস্তাদ হয়ে সম্মানিত হয়েছি।’

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة

‘একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার দৃষ্টিতে ইবাদতের জন্য সারারাত জাগ্রত থাকার চেয়ে শ্রেয়।’

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه

‘রাত্রি জাগরণকারী এবং সাওম পালনকারী এক হাজার আবেদের মৃত্যুর চেয়ে আল্লাহ তা‘আলার হালাল-হারামের জ্ঞান রাখা একজন আলেমের মৃত্যু অনেক বেশি ভারি।’

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলতেন,

من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله

‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হওয়াকে জিহাদ বলে মনে করে না তার চিন্তা ও বিবেকের ঘাটতি আছে।’

ইলমের প্রচারকের ফযীলত বর্ণনা করে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل

‘যে ব্যক্তি অন্যের কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করল আর সে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করল তবে বর্ণনাকারীও সমপরিমাণ ছাওয়াব লাভ করবে।’

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواته

‘ইলম উঠে যাওয়ার আগেই তা শিক্ষা কর। আর এর উঠে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাকারীর মৃত্যু ঘটা।’

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কুমাইলকে লক্ষ্য করে বলতেন,

يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق

‘হে কুমাইল! ইলম সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর সম্পদকে তোমার পাহারা দিতে হয়। ইলম শাসক, পক্ষান্তরে সম্পদ প্রজা। সম্পদ খরচ করলে কমে যায় কিন্তু ইলম খরচ করলে তা বৃদ্ধি পায়।’

ইলমের দাবী করাও গৌরবের বিষয়

মানুষ সাধারণত ওইসব বস্তুর দাবি করা এবং তা নিজের মধ্যে থাকাকে গৌরবের মনে করে যা অমূল্য ও সর্বজন প্রশংসনীয়। এই হিসেবে ইলম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। একারণেই দুনিয়ার কেউই ‘নিজে জাহেল’ একথা স্বীকার করতে চায় না এবং কেউ তাকে জাহেল বলুক তাও পছন্দ করে না। কেউ তাকে ‘জাননেওয়ালা’ কিংবা ‘ইলমওয়ালা’ বললে খুশি হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذمّاً أن يتبرأ منه من هو فيه

‘ইলমের মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার জন্য এটাই বড় আলামত, যে কেউ ইলম রাখে না সেও ইলমের সঙ্গে সম্বোধিত হলে খুশি হয়। আর

মূর্খতার নীচতার প্রমাণ এই, যার মধ্যে এই মূর্খতা আছে সেও এ থেকে পানাহ চায় এবং মূর্খতার নামে সম্পৃক্ত হওয়া অপছন্দ করে।'

ইলমের মজলিসই প্রকৃত সম্পদের মজলিস

দুনিয়ার মানুষ চোখে মোটা চশমার ফ্রেম পরায় দেখতে পায় না কোনটা মূল্যবান সম্পদ আর কোনটা মূল্যহীন এবং নগণ্য সম্পদ। একারণেই পার্থিব জগতের সাফল্যকে বড় করে দেখে এবং আখিরাতের অফুরন্ত সম্পদ ও নেয়ামত বেমালুম ভুলে যায়। অথচ অফুরন্ত নিয়ামত ও মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আখিরাতের সম্পদ। আর আখিরাতের নিয়ামত ও মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে ইলম। একারণেই ইলমের মজলিসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের মজলিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে হাদীছের কিতাবে। যেমন:

جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى أهل السوق و هم يتبايعون و يتشارَون ، فقال: " أنتم هاهنا و ميراث النبي صلى الله عليه و سلم يُقسَم في المسجد ؟ " فتركوا بضائعهم و ذهبوا يتراكضون إلى المسجد ، فدخلوا و ما وجدوا إلا حلقةً هنا تعلِّم التفسير ، و أخرى تعلِّم الحديث ، فرجعوا و قالوا: يا أبا هريرة غفر الله لك ، ما رأينا شيئاً ! ، قال: أوَ ذهبتم ؟ قالوا: نعم ، قال: فماذا رأيتم ؟ قالوا: رأينا قوما يعلِّمونَ القرآن و قوماً يعلِّمون التفسير وقوماً يعلِّمون الحديث ! قال: و هل ميراثُ رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا هذا؟

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার বাজারে গেলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এখনো এখানে? অথচ মসজিদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাছ বণ্টন হচ্ছে! তার কথায় লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদ পানে ছুটে গেলেন। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন কোথাও তাফসীরের মজলিস হচ্ছে, কোথাও হাদীছের দরস হচ্ছে। ফলে তারা মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে দেখা হলে বললেন, আবূ হুরায়রা! আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আমরা তো আপনার কথার সত্যতা দেখতে পেলাম না! আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তবে তোমরা সেখানে কী দেখেছ? তারা বললেন, আমরা একদল লোককে কুরআনের, আরেকদলকে হাদীছের দরসে লিপ্ত দেখলাম। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাছ।’

পৃথিবীর একটি বস্তুর চাহিদার সমাপ্তি নেই

পৃথিবীর সব বস্তুর চাহিদা ও বাসনা একটা পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। আকর্ষণ ও আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু ইলম এমন বস্তু যার আকর্ষণ ও চাহিদা কখনও নিঃশেষ হয় না। কাতাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لو كان أحد يكتفي من العلم بشئ لاكتفي موسى عليه السلام ولكنه قال للخضر عليه السلام: (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)

'যদি ইলমের চাহিদা শেষ হতো তবে (সর্বপ্রথম) মূসা (আ.)-এর চাহিদা শেষ হতো। কিন্তু তিনি খিজির (আ.)-কে বললেন, আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি, যাতে আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দেন?'

ইলমের এই সীমাহীন মর্যাদা, ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় বানিয়েছিলেন ইলম। আজ আমরা যেমন পার্থিব বস্তুসামগ্রী হাসিল করতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করি তারা সেরূপ করতেন না। কে কত বেশি আমল ও ইলম হাসিল করতে পারেন তারা সেই প্রতিযোগিতাই করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণের আদেশ করেছেন। তবে আমাদের কি উচিত নয় তাদের আদর্শ গ্রহণ করে ইলমের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া?

উম্মতের সম্মানিত পূর্বসূরী আলেমগণের দৃষ্টিতে ইলম

ইমাম মালেক (রহ.)-এর বিখ্যাত শাগরেদ ইবন ওয়াহাব (রহ.) বলেন, 'আমি একদিন ইমাম মালেক (রহ.)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। সে সময় মুআযযিন আযান দিলে আমি কিতাবপত্র গুছিয়ে সালাতের দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ করলাম। তখন ইমাম মালেক (রহ.) বললেন-

على رسلك ! ترفَّق ليس الذي تقوم إليه - يعني من التنفل قبل الفريضة - بأفضل مما تقوم عنه إذا صحَّت النية

‘একটু দাঁড়াও। মনে রেখো, যে উদ্দেশ্যে (ফরযের পূর্বের নফল সালাত) যাচ্ছো, তা যা থেকে যাচ্ছো তা থেকে উত্তম নয়; যদি নিয়ত সহীহ থাকে।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

طلب العلم أفضل من النافلة

‘ইলম তলব করা নফল সালাতের চেয়ে উত্তম।’

পূর্বসূরীগণ ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে আকীদা রাখতেন। শায়খ আব্দুর রহমান ইবন সাদী (রহ.) বলেন,

أن أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله - تعالى - بتوقير العلماء وتعظيم حُرمتهم

‘আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাত ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতেন।’

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار

‘পূর্বসূরীগণ এই বিশ্বাস রাখেন, একজন আলেমের মৃত্যু ইসলামের দেহ ছিদ্র হয়ে যাওয়ার ন্যায়। দিনরাতের পরিবর্তন যা ভরাট করতে পারে না।’

তিনি আরো বলতেন,

لموت قبيلة أيسر من موت عالم

‘একটি গোত্রের সকলের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে অনেক সহজ।’

বিখ্যাত তাবে‘ঈ ইমাম যুহরী (রহ.) বলতেন,

ما عُبِدَ الله بشيءٍ أفضلَ من العلم

‘ইলমের চেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত নেই।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو في شيء حقير فرح ومن رفع عنه حزن

‘ইলমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে, যার সঙ্গেই ইলম সম্পৃক্ত হয়-যদিও তা তুচ্ছ বিষয়ের ইলম হোক না কেন- আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হয়। আর যার থেকে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয় সে পেরেশান হয়।’

আহনফ (রহ.) বলতেন,

كل عز ولم يؤيد بعلم فإلى ذل مصيره

‘যে ইজ্জত ইলমকেন্দ্রিক নয়, তার শেষ পরিণতি লাঞ্ছনা।’

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন,

لا أعلم بعد النُّبوة أفضل من العلم ، لأن العالم هو وريث النبي الخ

‘নবুওয়াতের মর্যাদার পর ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা আলেম হচ্ছেন নবীর ওয়ারিছ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের ওয়ারিছ বানান না বরং তারা ইলমের ওয়ারিছ বানান।’

আবূল আছওয়াদ (রহ.) বলেন,

ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك

‘ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো বস্তু নেই। বাদশারা তো সাধারণ মানুষের শাসক কিন্তু আলেমগণ বাদশাহদের শাসক।’

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন,

الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء

‘আমাদের দৃষ্টিতে মানুষ বলতে আলেমই বুঝায়। তারা ছাড়া অন্যরা কিছু নয়।’

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন,

لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة

'যদি একজন আলেম পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করেন তবে তিনিই বিশাল এক জামাতের মর্যাদা লাভ করবেন।'

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-

من الناس؟ فقال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين

'মানুষ কারা? তিনি জবাবে বললেন, ওলামায়ে কেরাম। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, বাদশাহ কারা? তিনি বললেন, দুনিয়াবিমুখ লোকেরা। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, আর নিকৃষ্ট লোক কারা? তিনি বললেন, যারা দীনের বদলায় দুনিয়া কামায় তারাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।'

ইলমশূন্য মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো

হাসান বসরী (রহ.) বলতেন,

لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم الخ

'যদি ওলামায়ে কেরাম না থাকতেন তবে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর কাতারে নেমে যেত।' অর্থাৎ মানুষ কেবল ইলমের কারণেই চতুষ্পদ জন্তুর কাতার থেকে মানুষের কাতারে উন্নীত হতে সক্ষম হয়।'

বস্তুত অন্য যাবতীয় মাখলুক থেকে মানুষের আলাদা হওয়ার অবশ্যই কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর সেই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে ইলম। মানুষ

তো এ কারণেই মানুষ হয়েছে। সে তার ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থের কারণে জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে আলাদা ও মর্যাদাশীল নয়। যদি শারীরিক সামর্থ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার কারণে কেউ শ্রেষ্ঠ হতো উট সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। কেননা উট প্রাণীকুলের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী। শারীরিক কাঠামো ও বপুতার কারণেও মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়। যদি তাই হতো তবে স্থলভাগের হাতি এবং পানির তিমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। বাহাদুরি ও বীরত্বের কারণেও কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। যদি হতো তবে হিংস্র বাঘ সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। খাওয়ার সামর্থের কারণেও কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। যদি তাই হতো তবে গরু-মহিষ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। কেননা তাদের চেয়ে বড় পেট ও পেটুক কোনো প্রাণী নেই। সুতরাং অন্যান্য মাখলুকের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একটি মাপকাঠি আছে। আর নিঃসন্দেহে সেটা হচ্ছে ইলম।

ইলমের বদৌলতে ইতর প্রাণীও সম্মানিত

ইলমের কারণে মানুষ তো বটেই, আল্লাহ তা'আলা ইতর প্রাণীকেও সম্মানিত করেছেন। শিকারের জ্ঞান রাখা কুকুরকে তিনি অন্যান্য কুকুরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٤ ﴾ [المائدة: ٤]

‘তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বল, ‘তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভাল বস্তু এবং শিকারী পশু-পাখী, যাদেরকে তোমরা শিকার প্রশিক্ষণ দিয়েছ; সেগুলোকে তোমরা শেখাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, যা তোমাদের জন্য ধরে এনেছে এবং তাতে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪}

এই আয়াত একথার প্রমাণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটা কুকুর অন্য কুকুর থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং ইতর প্রাণী কুকুর যদি ইলমের কারণে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয় তবে মানুষ যদি এই ইলম অর্জন করে তবে সে অন্য মানুষের তুলনায় কতদূর এগিয়ে যেতে পারে?

ইলম মানসিক প্রশান্তির কারণ

পূর্বসূরীগণ বলেন,

إن السرور والانشراح ياتي مع العلم ، لأن العلم عثور على الغامض، وحصول على الضالة واكتشاف للمستور والنفس مولعة بمعرفة الجديد والاطلاع على المستطرف.أما الجهل فهو ملل وحزن ، لأنه حياة لا جديد فيها ولا طريف ، و لا مستعذب ، أمس كاليوم ، واليوم كالغد. فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم وحصل الفوائد، لتذهب عنك الغموم والهموم والأحزان.

‘আনন্দ ও মনের প্রফুল্লতা অর্জিত হয় ইলমের মাধ্যমে। কেননা ইলম অস্পষ্টতার পর্দা উন্মোচন করে, হৃতগৌরব উদ্ধার করে, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞান উদ্ভাসিত করে এবং সাফল্যের নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে। আর মানুষের আত্মা এসব বস্তু দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে মূর্খতা হচ্ছে লাঞ্ছনার নাম। মূর্খ এমন জীব যার প্রাণ নেই। চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক কিছু নেই। তার জীবনের গতকাল এবং আজ সমান। আর আগামীকাল ব্যর্থতার গ্লানিতে কর্দমাক্ত। সুতরাং হে বন্ধু! তুমি যদি সৌভাগ্যের পরশ পেতে চাও তবে ইলম অন্বেষণ কর। তবেই দুশ্চিন্তা দূর হবে, পেরেশানমুক্ত হবে।

আলেমদের হাশর হবে নবীগণের সঙ্গে

ইলমের অন্যতম ফযীলত হচ্ছে, আলেমদের হাশর হবে নবী-রাসূলগণের সঙ্গে। কেয়ামতের দিন এরচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে যে, সাধারণ মানুষ হয়েও শুধু ইলমের বরকতে একজন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মহা সম্মানী নবী-রাসূলগণের সঙ্গে উঠতে সক্ষম হবেন? পৃথিবীর যাবতীয় পদ-পদবীর জন্য হাশরের মাঠে আক্ষেপ হবে, সেদিনের গৌরবের পদবী হবে কেবল নবী ও রাসূলগণের পদবী। সেই নবী-রাসূলগণের সঙ্গে হাশর হওয়া কত যে গৌরব ও মর্যাদার, আমাদের জন্য তা ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব না, হৃদয় দিয়ে এর গভীরে পৌঁছাও সহজ না। অবশ্য

আমাদের পূর্বসূরীগণ এর মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনৈক বুযুর্গকে বিচারকের পদ গ্রহণ করার অনুরোধ করলে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন,

إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك

'আমি ইলম শিক্ষা করেছি নবীগণের সঙ্গে হাশর হওয়ার জন্য, বাদশাদের সঙ্গে হাশর হওয়ার জন্য নয়। কেননা আলেমদের হাশর হবে নবীগণের সঙ্গে আর বিচারকদের হাশর হবে বাদশাদের সঙ্গে।'

পুণ্যবান পূর্বসূরীর মুখে বিদ্যাহীনতার নিন্দা

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران علم من القرآن أو من سنة يجعله ليس من الأحياء، فالعالمون أحياء وغيرُهم أموات

'মূর্খতা হচ্ছে জীবননাশক ব্যাধি। এটা কখন রোগীকে মেরে ফেলে রোগী তা নিজেও টের পায় না। আর এর আরোগ্য রয়েছে দুটি বস্তুতে। কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান। অথবা বলা যায়, মূর্খতা মানুষকে মৃতের কাতারে নিয়ে যায়। অতএব কেবল ইলমওয়ালারা জীবিত, অন্যরা মৃত।'

মূর্খতা ও অজ্ঞতা কলবের মৃত্যু ঘটায়

ফাতহ আল-মুসিলী (রহ.) বলেন,

أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى، قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم يموت.

‘রোগীকে যদি খাবার-পানীয় ও ঔষধ থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে কি তার মুত্যু ঘটবে না? লোকেরা জবাবে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এমনিভাবে অন্তরকে যদি ইলম ও হিকমত থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তবে কলবের মৃত্যু ঘটে।’

বাস্তবেও তাই। কেননা অন্তরের খাদ্য হচ্ছে ইলম ও হিকমত এবং এর দ্বারাই অন্তর যিন্দা থাকে। যেভাবে খাবারের দ্বারা মানুষের দেহ টিকে থাকে। তাই যে ইলম থেকে বঞ্চিত হয় তার অন্তর রোগাক্রান্ত হয় এবং অন্তরের মৃত্যু আবশ্যক হয়ে যায়। কিন্তু দুনিয়ার তীব্র ভালোবাসার কারণে তার অনুভূতি শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় বলে সে তা অনুভব করতে পারে না।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، فإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم

‘ওলামায়ে কেরামের (ইলম শিক্ষার) কালিকে শহীদের রক্তের সঙ্গে ওজন করা হবে এবং ওলামায়ে কেরামের কালিই ওজনে ভারি হবে।

ওই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় শহীদ হয়েছেন তারা কেয়ামত দিবসে আলেমদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে আলেম হিসেবেই উত্থিত হওয়া কামনা করবেন। আর কোনো ব্যক্তি আলেম হয়ে জন্ম নেয় না, বরং তাকে ইলম শিক্ষা করে আলেম হতে হয়।’

আল্লাহর বাণী,

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

‘আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১} এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة

‘দুনিয়ার হাসানা (কল্যাণ) হচ্ছে ইলম ও ইবাদত। আর আখেরাতের হাসানা (কল্যাণ) হচ্ছে জান্নাত।’

জনৈক হাকিমকে জিজ্ঞেস করা হলো-

أي الأشياء تقتني قال الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك

‘কোন বস্তু উপার্জন ও চয়ন করচ? জবাবে তিনি বললেন, ওই সব বস্তু, তোমার জাহাজ ডুবে গেলে যা তোমাকে নিয়ে সাঁতার কেটে ভাসাবে।’ অর্থাৎ ইলম।

এখানে জাহাজ ডুবে যাওয়ার দ্বারা মৃত্যুর কারণে দেহ নিঃশেষ হওয়া উদ্দেশ্য।

অন্য এক হাকিম বলেন,

من اتخذ الحكمة لجاما اتخذه الناس إماما ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار

‘যে ব্যক্তি হেকমত ও ইলমের লাগাম পরিধান করে, লোকেরা তাকে ইমাম ও বরণীয় ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি ইলম ও হিকমত দ্বারা পরিচিত হয় তার দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টি প্রদান করা হয়।’

ইলম সম্মানিত করে

সালেম ইবন আবূ শুজা‘ বলেন, ‘আমার মুনিব তিনশত দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে আমাকে আজাদ করে দেন। আজাদ হওয়ার পর বললাম, আমি কোন পেশায় জড়িত হতে পারি? অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত ইলমের অন্বেষণে লেগে পড়লাম। এই অবস্থায় এক বছরও গত হলো না, এরই মধ্যে শহরের প্রশাসক আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিলাম না।’

ইলমের প্রয়োজনীয়তা সার্বক্ষণিক

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন,

الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت

‘মানুষ খানাপিনার চেয়ে ইলমের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। কেননা দিনে মাত্র দুই-তিনবার খানাপিনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইলমের প্রয়োজন প্রতি মুহূর্ত এবং সারা জীবন।’

ইলম সম্পদ ও সম্মান আনে

যুবায়ের ইবন আবূ বকর (রহ.) বলেন,

كتب إلي أبي بالعراق عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا

আমার পিতা আমাকে ইরাকে লিখে পাঠালেন, ‘হে বৎস! তুমি অবশ্যই ইলম অন্বেষণ করো। কেননা তুমি যদি দরিদ্র হও তবে ইলমের বরকতে সম্পদ লাভ করবে। আর যদি ধনী হও তবে এটা তোমার সৌন্দর্যের কারণ হবে।’

ইলম ছাড়া সম্মান তালাশ করা বোকামী

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) বলেন,

عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟

'আমি ওই ব্যক্তিকে দেখে খুব বিস্ময় বোধ করি, যে ইলম অন্বেষণ করে নি অথচ সম্মান তালাশ করে!'

আতা (রহ.) বলেন,

مجلس علم يكفر سبعين مجلسا من مجالس اللهو

'একটি ইলমের মজলিস সত্তরটি অহেতুক মজলিসের পাপ মোচন করে দেয়।'

ইলমের মীরাছ স্বর্ণ-রূপার মিরাছের চেয়ে শ্রেষ্ঠ

উবায়দুল্লাহ ইবন কাছীর (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ ولا يستطاع العلم براحة الجسم

'ইলম স্বর্ণ-রূপার মিরাছের চেয়ে শ্রেয়। নেককার মানুষ মনি-মুক্তার চেয়ে উত্তম। আর ইলম শারীরিক আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে হাসিল হয় না।' অর্থাৎ দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে হলে এর পিছনে শ্রম দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

ইলমের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হাকিম-বিজ্ঞগণের বক্তব্য ও মন্তব্য

ইলম হাসিলে লুকমানের উপদেশ:

লুকমান (রহ.) হিকমত ও প্রজ্ঞার জন্য বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি পুত্রকে বিভিন্ন সময় শিক্ষণীয় উপদেশ দিতেন। ইতিহাসের পাতায় তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত আছে। ইলমের গুরুত্ব প্রদান করে তিনি পুত্রকে ওসিয়ত করেছিলেন-

يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء

‘হে বৎস! তুমি ওলামায়ে কেরামের মজলিসে বসো এবং তোমার দু’হাঁটু বসিয়ে তাদের কাছে ভীড় জমাও। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ইলম ও হিকমতের বদৌলতে অন্তরকে জীবন্ত করেন, যেভাবে আসমানের পানি (বৃষ্টি) দ্বারা জমিনকে জীবিত করেন।’

আলেমের মৃত্যুতে জীব-জন্তুর কান্না

জনৈক হাকিম বলেন,

إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء والطير في الهواء ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره

আলেমের মৃত্যু হলে পানির মাছ এবং শূন্যে চলমান পাখি কান্না করে। তার চেহারা খুঁজে ফেরে আর তার স্মরণ জারি রাখে।

ইলম ছাড়া করুণা লাভ করা যায় না

জনৈক হাকিম বলেন,

إني لا أرحم رجالا كرحمتي لأحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفهم، ورجل يفهم العلم ولا يطلبه

'আমি দুইজন ব্যক্তিকে যেভাবে করুণা করি অন্য কাউকে তা করি না। সে দুইজন হলেন, এক. ওই ব্যক্তি, যিনি ইলম তলব করেন যদিও এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। দুই. ওই ব্যক্তি, যিনি ইলমের মর্মার্থ অনুধাবন করেন কিন্তু (বেশি মাত্রায়) ইলম তলব করেন না।'

আলেম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনকারী

এক আলেম বলেন,

العالم يدخل فيما بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل

'আলেম আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মাখলুকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। সুতরাং মানুষ যেন ভাবে যে, সে কীভাবে তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করবে।'

যে শহরে ইলম অন্বেষণকারী নেই তা বাসযোগ্য নয়

বর্ণিত আছে-

روى أن سفيان الثوري رحمه الله قدم عسقلان فمكث لا يسأله إنسان فقال اكروا لي لأخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم

‘একবার সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) আসকালান শহরে গমন করেন এবং সেখানে বেশকিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু অবস্থানকালে একজন লোকও তাঁর কাছে ইলম শিক্ষা করতে আসল না এবং তাঁকে ইলমের কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করল না। তিনি লোকজনকে বললেন, এই শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য দ্রুত আমার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করো। কেননা এই শহরে ইলম মৃত। আর যে শহরে ইলম মৃত সেই শহর বাসযোগ্য নয়।’

আতা (রহ.) বলেন,

دخلت على سعيد وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال ليس أحد يسألني عن شيء

‘আমি সাঈদ ইবন মুসাইয়িব (রহ.)-এর মজলিসে গেলাম। ওই সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এখানে ইলমের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করার করা মতো একজন লোকও নেই!’

ইলমহীন ব্যক্তি ইসলাম ধ্বংসকারী

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, ‘ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কোনো ব্যক্তিকে দেখলে প্রথমে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। যদি তিনি আলেম ও আমলদার হতেন তবে ছেড়ে দিতেন। অন্যথায় তাকে তিক্ত ভাষায় ভর্ৎসনা করতেন এবং বলতেন,

لا جزاك الله خيراً لا عن نفسك و لا عن الإسلام ضيَّعتَ نفسك و ضيَّعتَ الإسلام

‘আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় না দিন- না তোমার নিজের থেকে না ইসলাম থেকে। তুমি নিজেকেও ধ্বংস করেছ, ইসলামকেও ধ্বংস করেছ!’

জনৈক বুযুর্গ বলেন,

العلماء سرج الأزمنة كل واحد مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره

‘আলেমগণ যুগের প্রদীপ, প্রত্যেকের নিজের সময়ের বাতিস্বরূপ; লোকেরা তাদের থেকে আলো সংগ্রহকারী।’

আলেমগণ এই উম্মতের সবচেয়ে কল্যাণকামী মানুষ

ইয়াহইয়া ইবন মু‘আয (রহ.) বলেন,

العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم قيل وكيف ذلك قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة

‘ওলামায়ে কেরাম উম্মাতে মুহাম্মাদীর সবচেয়ে কল্যাণকামী ব্যক্তি। এমনকি ব্যক্তির পিতামাতার চেয়েও বেশি করুণাকামী তারা। জিজ্ঞেস করা হলো; এটা কীভাবে? জবাবে তিনি বললেন, কেননা ব্যক্তির পিতামাতা তাকে দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচায় মাত্র, কিন্তু আলেমগণ বাঁচান আখেরাতের আগুন থেকে।’

ইলমের মূল্য

ইকরামা (রহ.) বলতেন,

إن لهذا العلم ثمنا قيل وما هو قال أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه

‘এই ইলমের একটি মূল্য আছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কী সেই মূল্য? তিনি বললেন, এর মূল্য হচ্ছে সে ব্যক্তিকে ইলম দেওয়া যে এর সঙ্গে সদাচার করে এবং একে বরবাদ করে না।’

বাতিলশক্তি খতম করতে ইলমী শক্তির প্রভাব

আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন, বাতিল ও অপশক্তি বাহ্যিকভাবে প্রবল হলেও সহীহ ও ইলমে নাফের মোকাবেলায় তা নিতান্তই নগণ্য। আল্লাহ তা‘আলা ইলমের মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত রেখেছেন যার দ্বারা বাতিল শক্তিকে পরাভূত করা খুব সহজ। এমনকি বাহ্যিকদৃষ্টিতে বাতিলের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যা বেশি অনুমিত হলেও। যেমন, মূসা (আ.)-এর ঘটনায় দেখা যায়,

ফিরাউনের ভাড়া করা জাদুকর সংখ্যায় ছিল অনেক। কিন্তু নবুওয়াতী ও ইলমী শক্তির কাছে তারা খুবই দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়। এই সংখ্যা ইলমী শক্তিকে নিঃশেষ করতে চাইলে নিজেই নিঃশেষ হয়ে যায়! বাতিলশক্তি তাদের শক্তি প্রদর্শন করে অসংখ্য সাপ-বিচ্ছুর মহড়া দেখায়। কিন্তু মূসা (আ.)-এর ইলমী ও নবুওয়াতী শক্তির এক ঝলকে তা ধ্বংস ও মিসমার হয়ে যায়। এভাবেই রচিত হয়েছে ইতিহাস। যখনই কোনো বাতিলশক্তি ইলম ও আলেমদের পথচলায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তখনই তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। আজ তারা ইতিহাসের নিকৃষ্ট উপমা! ইলম ও আলেমদের চলার পথ কেউ কখনও বন্ধ করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। এটাই আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা।

ইলমের সঙ্গে সময় কাটানো সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সময় কাটানোর মতো

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-এর মজলিসে একবার কিছু লোক আগমন করলেন। এর কিছুক্ষণ পর লোকগুলো মজলিস থেকে বের হয়ে গেলেন। তাদের চেহারার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো ইবন মুবারক (রহ.) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হননি। তাদের কেউ একজন বললেন, মনে হয় আপনার কাছে এমন কোনো লোক আছে যাদের প্রতি আপনার হৃদয়ের সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি একথা বলে ইঙ্গিত করেছেন পরিবার- পরিজনের দিকে। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবন

মুবারক (রহ.) বললেন, বরং তাদের চেয়েও প্রিয় কেউ আছেন। আমি তো সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈগণের সঙ্গে সময় কাটাই! অর্থাৎ আমি ইলমের সঙ্গে সময় কাটাই এবং ইলমের সঙ্গে সময় কাটানোটা আমার কাছে পরিবার-পরিজনের চেয়ে শ্রেয়।

পাচকের ঘরে বিচারক

ইলম মানুষকে নানাভাবে সম্মানিত করে। একটি ঘটনা বলি। হাশেম ইবন বাশির ইবন আবূ হাযেম সালামী ওয়াসেতী (রহ.)-এর পিতা ছিলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের পাচক। অবশ্য পরে এই পেশা ছেড়ে দিয়ে ফলের ব্যবসা শুরু করেন। বাশির পুত্র হাশেমকে ইলম অন্বেষণে বাধা দিতেন এবং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু পুত্র হাশেম ইলম অন্বেষণ থেকে বিরত হতে অস্বীকৃতি জানান। এভাবে চলতে থাকে দিন। একবার হঠাৎ হাশেম (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। সংবাদ পেয়ে ওয়াসেতের বিচারক আবূ শায়বা তাকে দেখতে আসেন। তার সঙ্গে আসেন গণ্যমান্য আরো অনেকেই। হাশেমের পিতা বাশির ঘটনা দেখে খুব খুশি হন এবং বলেন, হে বৎস! আমি বুঝতে পারছি ইলমের কারণেই তুমি এই মর্যাদায় উপনীত হয়েছো যে, স্বয়ং বিচারক তোমার সাক্ষাতে এসেছেন! আজ থেকে আমি তোমাকে ইলম অন্বেষণে বাধা দেব না।

হাশেম (রহ.) অত্যন্ত উঁচুমাপের বুযুর্গ ছিলেন। মালেক, শুবা, ছাওরী, আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) প্রমুখ বিখ্যাত হাদীছ বিশারদের কাছে

ইলমে হাদীছ অর্জন করেছেন। তিনিও ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতো ইবাদতগুজার।

ইলম সম্পদের জননী

এ দেশের মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে। ইলম শিক্ষা করলে 'খাবে কী' সেই দুঃচিন্তায় ঘুম হয় না অনেকের। অনেকে এধরনের অপপ্রচারও করে বেড়ায়। আর দুনিয়াপূজারীর দৃষ্টিতে একজন আলেমের জীবন চলারই কথা নয়! তাদের দৃষ্টি সার্টিফিকেট আর চাকরিতে। তাই তারা বংশের কেউ আলেম হোক তা কল্পনাও করতে পারে না। অথচ বিষয়টি বাস্তবে আদৌ এমন? প্রথমত ইলম শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, সমাজের সব মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। এই দুটি বস্তু হাসিল হলে ইলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। আর রিযিক? সেটা তো আল্লাহ তা'আলা দেবেন এবং তাঁর কুদরতী পদ্ধতি অনুযায়ী যাকে যেভাবে যে পরিমাণ দেয়ার তাকে সেভাবে সে পরিমাণই দান করবেন। তথাপি সমালোচনা এবং অপপ্রচারের জবাবে বলা যায়, ইলম শিক্ষায় রিযিকের অভাব হয় না বরং ইলমের বরকতে আল্লাহ তা'আলা রিযিকের মধ্যে প্রশস্তি দান করেন। এজন্য ইলমকে উম্মুল মাল বা সম্পদের জননী বলা হয়। বিখ্যাত মুহাক্কিক আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) ইলম ও মালের মধ্যে তুলনা করে

একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এতে তিনি ইলমকে বহুদিক দিয়ে মালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং ইলমকে মালের জননী আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেন, 'ইলম নবীগণের মীরাছ। পক্ষান্তরে সম্পদ ধনী এবং রাজা-বাদশাহদের মীরাছ। সুতরাং কোনটা শ্রেষ্ঠ? ধন-সম্পদকে মালিকের হেফাজত করতে হয়। পক্ষান্তরে ইলম মালিককে হেফাজত করে। মাল খরচ করলে কমে যায়। পক্ষান্তরে ইলম খরচ করলে তা দিন দিন বাড়ে। ইলম মালিককে সর্বদা সঙ্গ দেয়। এমনকি কবরের জগতেও। পক্ষান্তরে মাল ও ধন-সম্পদ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মালিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইলম ধন-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করে। সুতরাং ইলম শাসক আর মাল শাসিত।

মাল ও ধন-সম্পদ ভালো-মন্দ, মুসলিম-কাফের এবং নেককার-পাপী সবাই হাসিল করতে পারে। কিন্তু ইলমের ধন একমাত্র নেককার মুমিন ব্যক্তিই হাসিল করতে পারে। আলেমের কাছে রাজা-বাদশাহ সকলেই মুহতাজ তথা মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে ধনীর কাছে কেবল অভাবী ব্যক্তি মুহতাজ। ধন-সম্পদের অধিকারী যখন তখন নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আলেমের সেই শঙ্কা নেই।

সম্পদ কখনও কখনও মালিকের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। ইতিহাসের এধরনের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, কারুন, নমরুদ, শাদ্দাদ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইলম আলেমের জন্য জীবনস্বরূপ, এমনকি তা মৃত্যুর পরেও।'

মালের সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী পক্ষান্তরে ইলমের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী

আলেমের কদর ও সম্মান তার ব্যক্তিসত্তায় নিহিত। পক্ষান্তরে ধনীর সম্মান তার মালের মধ্যে নিহিত। ধনী ব্যক্তি তার সম্পদের মাধ্যমে মানুষকে দুনিয়ার দিকে আহ্বান করে। পক্ষান্তরে আলেম ইলমের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করে আখেরাতের দিকে।

ইলম মানুষের জীবনকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জগতে কীভাবে উন্নতি বয়ে আনে তার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) উম্মতের মুহসিনগণের (কল্যাণকারী) একজন, যাদের অবদানের ভারে উম্মতের গর্দান সর্বদা নুয়ে থাকে। বিশেষ করে ফিকহে হানাফীর অনুসারীদের জন্য তার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি শুধু একজন ফকীহ হিসেবেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর ইলম ও ফিকহ উম্মতের কাছে পৌঁছে দেন নি, বরং একজন প্রধান বিচারপতি হিসেবে ফিকহকে দর্শন থেকে বের করে এনে এর আমলী রূপও দান করেছেন।

আলী ইবন জা'দ (রহ.) বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বাল্যকালেই পিতা ইবরাহীম ইবন হাবীবের স্নেহ হারিয়েছিলেন। ফলে অভাবে অপরাগ হয়ে মা তাকে ধোপার কাছে ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। তাই তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দরসে শরীক হতেন। মা এই তথ্য জেনে তাকে দরসে যেতে বাধা দিলেন

এবং সে কারণে তিনি কয়েকদিন আবূ হানীফা (রহ.)-এর দরসে অনুপস্থিত থাকলেন।

মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্রের প্রতি উস্তাদদের আলাদা দৃষ্টি থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাই কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার পর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) দরসে উপস্থিত হলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) আদ্যোপান্ত ঘটনা বলেন। ঘটনা শুনে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) দরস থেকে তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং একশ দিরহামের একটি থলি হাতে তুলে দিলেন। দেওয়ার সময় বললেন, আপাতত এই দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করো। ফুরিয়ে গেলে আমাকে জানাতে ভুল করো না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) বলেন, এরপর থেকে আমাকে কখনও বলতে হয়নি যে, আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে। বরং টাকা ফুরিয়ে গেলে তিনি নিজ থেকেই আমাকে আবার টাকা দিতেন। যেন পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তিনি নিজ থেকেই আঁচ করতে পারতেন!

মা এটা জেনে ভাবলেন, এভাবে আর কতদিন চলবে? বরং একটা স্থায়ী সমাধান এবং জীবিকার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। একারণে একদিন তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, জনাব! এ তো ইয়াতিম বাচ্চা। আমি চাচ্ছি, সে কাজ শিখে জীবিকার স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করে নিক, আপনি তাকে আপনার

দরবারে উপস্থিত হতে বারণ করে দিন। মায়ের কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বললেন-

هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق

‘সে তো ইলম শিক্ষা করে পেস্তার ঘিতে ফালুদা খাওয়া শিখছে!’

মা এটাকে নিছক কৌতুক মনে করলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك

‘আপনি বৃদ্ধ মানুষ। তাই আপনার আকল নষ্ট ও অকার্যকর হয়ে গেছে!’

কিন্তু কথাটির মর্ম ঠিকই বুঝেছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এই ইলমের বদৌলতে বিচারকের পদ দান করেছেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত খলীফা হারুনুর রশীদের দস্তরখানে খুব বেশি আমন্ত্রিত হতেন। তিনি বলেন,

فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون فالوذجة فقال لي يا يعقوب كل منها فليس في كل يوم يعمل لنا مثلها فقلت وما هذه يا أمير المؤمنين فقال هذه فالوذجة بدهن الفستق

‘একবার আমি হারুনুর রশীদের দস্তরখানে বসা ছিলাম। এসময় তিনি আমার সামনে একটি পেয়ালায় পেস্তার ঘিতে বানানো ফালুদা পেশ করেন এবং বলেন, এটি একেবারেই খাঁটি বস্তু। হে ইয়াকুব! ভক্ষণ করুন। এগুলো সবসময় বানানো হয় না। বরং আমার জন্য

মাঝে-মধ্যে প্রস্তুত করা হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমীরুল মুমিনীন! এগুলো কী? তিনি জবাবে বললেন, পেস্তার ঘিয়ে ভাজা ফালুদা।

আমি তার কথায় হেসে উঠলাম। তিনি হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি পুরো ঘটনা ব্যক্ত করলাম। ঘটনা শুনে তিনিও অবাক হলেন এবং বললেন-

لعمري: إنه العلم ليرفع وينفع ديناً ودنيا وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه

'আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয় এই ইলম দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদা বুলন্দ করে।' এরপর তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রতি রহমতের দু'আ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফাকে রহম করুন। তিনি সবকিছু অন্তর্চক্ষু দিয়ে অবলোকন করতেন, যা বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা যায় না।' [ওয়াফায়াতুল আইয়ান ওয়া আবনাউয যামান: ৮/২২১]

পূর্ববতী যুগের রাজা-বাদশাদের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব

বর্তমান যুগের রাজা-বাদশা ও ক্ষমতাশালীরা নিজেদের সন্তানদের পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থায় পারদর্শী করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন এবং কুরআন-হাদীছের জ্ঞান থেকে তাদের একেবারেই বঞ্চিত করেন। কিন্তু অতীতের কীর্তিমান শাসকগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

তারা তাদের সন্তানদের কুরআন-হাদীছের ইলম শিখিয়ে ধন্য হতেন এবং সন্তানদের জীবন ধন্য হয়েছে বলে মনে করতেন। বেশিদিন আগের কথা নয়। মোঘল সম্রাট আলমগীরের কথাই ধরুন। ভারত শাসন করেছেন যারা তাদের কয়জন তার মতো কৃতিত্ব ও ইতিহাসে স্মরণীয় হতে পেরেছেন?

'বাদশা আলমগীর, কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লির' হৃদয়কাড়া কবিতার এই অংশই প্রমাণ করে বিখ্যাত মোঘল সম্রাট পুত্রের জন্য কী ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজেও অত্যন্ত ইলম-অনুরাগী ছিলেন। বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়ার গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে আলমগির' তারই তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

আগের যুগের সকল খলীফা ও আমীর-উমারা এরূপই ইলমের প্রতি সীমাহীন অনুরাগী ছিলেন। যেমন বিখ্যাত শাসক আবদুল মালেক ইবন মারওয়ান তার পুত্রকে উপদেশ প্রদান করে বলেছিলেন-

يا بنيّ تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم وإن كنتم وسطاً سدتم وإن كنتم سوقة عشتم

'হে বৎস! ইলম শিক্ষা করো। কেননা যদি নেতা হও তবে সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। যদি মধ্যম ধরনের লোক হও তবে নেতার আসন লাভ করতে পারবে। আর যদি সাধারণ প্রজা হও তবে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে পারবে।'

এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করে বলেন,

ومن لم يذق مر التعلم ساعة   تجرع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعليم وقت شبابه   فكبر عليه أربعا لوفاته

وذات الفتى والله بالعلم والتقى   إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের কিঞ্চিত তিক্ততা বরদাশত করে না, সে দিনের পর দিন মূর্খতার লাঞ্ছনা গিলতে বাধ্য হয়।

যৌবনে যার ইলম শিক্ষা করার সুযোগ হয়নি তার ওপর (জানাযার) চার তাকবীর পাঠ করো। কেননা সে তো মৃত!

আল্লাহ তা'আলার শপথ! যুবকের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তার ইলম ও তাকওয়ার কারণে। যদি এই দুটি বস্তু না থাকে তবে তার কোনো মূল্যই নেই।'

ইলমের কারণে বিধর্মীও সম্মানযোগ্য

ইলম এমন এক দৌলত, যার বদৌলতে একজন বিধর্মীও সম্মান লাভের যোগ্য হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বদর যুদ্ধে ৭০জন কাফের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে মদীনায় নীত হয়। মক্কাবাসী সে সময় আরবী পঠন ও লিখন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। পক্ষান্তরে মদীনাবাসী ছিল এর বিপরীত। তারা ছিল নিরক্ষর। যুদ্ধবন্দীদের কিছু ছিল মূর্খ, লেখাপড়া না জানা। তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়। আর যারা ছিল শিক্ষিত তাদের প্রত্যেকের যিম্মায় মদীনার দশজন করে শিশু ন্যস্ত করা হয় এবং এদের শিক্ষা

প্রদানকে তাদের মুক্তিপণ সাব্যস্ত করা হয়। এভাবে তারা বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র ইলমের কারণে তাদেরকে সম্মান করেন এবং অন্যদের তুলনায় ভিন্ন মর্যাদা প্রদান করেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইলম এমন এক সম্পদ, যার বদৌলতে একজন বিধর্মীও সম্মানের পাত্র হতে পারে। সুতরাং কোনো মুসলিম যদি এই ইলমের অধিকারী হয় তবে তার সম্মান কত বেশি হতে পারে?

কাব্য-কবিতা ও শের-আশ্‌আরে ইলমের মর্যাদা ও প্রশস্তি

জনৈক কবি বলেন,

يموت قوَم فيحيي العلم ذكرهم   والجهل يلحق أمواتاً بأموات

'মানুষ মারা যায়, কিন্তু ইলম তার স্মরণকে জীবিত রাখে। আর মূর্খরা মরে গিয়ে কেবল মৃত হিসেবে মৃতদের সঙ্গে মিলিত হয়।'

زوال بزوالها ، ومحبة العالم دين يدان به

يكسبه الطاعة في حياته ، وجميل الأحدوثة بعد موته.

-مات خزان المال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقي الدهر ،

أعيانهم مفقودة ، وآثارهم في القلوب موجودة!

'সম্পদের সৃষ্টি সম্পদের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু আলেমের মহব্বত হচ্ছে দীন, যদ্বারা মানুষের দীন পালিত হয়।

এর দ্বারা জীবদ্দশায় আনুগত্য হাসিল হয় এবং মৃত্যুর পর তা উত্তম কথা হয়ে থাকে।

মালের রক্ষকরা মারা যায়, কিন্তু আলেমরা যুগ যুগ ধরে অমর থাকেন।

তাদের সম্পদ হারিয়ে যায় কিন্তু আলেমদের প্রভাব ও স্মরণ মানুষের হৃদয়ে গ্রোথিত ও অম্লান হয়ে থাকে।'

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আলেমের কীর্তির অমরত্বের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে-

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم

على الهدي لمن استهدى أدلاء

فاظفر بعلم ولا تبغي به بدلا

فالناس موتى وأهل العلم أحياء

'সম্মান কেবল আলেমদেরই জন্য, তারা হেদায়াতের পথে চলমান এবং হেদায়াত প্রত্যাশীর পথপ্রদর্শক। সুতরাং তুমি ইলম দ্বারাই সৌভাগ্য হাসিল করতে সচেষ্ট হও এবং এর মোকাবেলায় অন্য কোনো বস্তু গ্রহণ করো না। কেননা, অন্যান্য মানুষ মৃত আর আলেমগণ অমর, তাদের কীর্তি জীবিত।'

আরেক বুযুর্গ বলেন,

علم الإنسان ولده المخلد

'মানুষের ইলম হলো তার চিরস্থায়ী সন্তান।'

আবূল ফাতহ মুহাম্মাদ আল-বুস্তী (রহ.) বলেন,

يقولون ذكر المرء يبقى بنسله □□□ و ليس له ذكر إذا لم يكن نسل

فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي □□□ فمن سره نسل فإنا بذا نسلو

'মানুষ বলে, বংশ দ্বারা মানুষ স্মরণীয় হয়, এর দ্বারা তার নাম বাকি থাকে। তাই যদি বংশ না থাকে তবে কেউ তাকে স্মরণ করে না। আমি তাদেরকে বলব, আমার বংশ হচ্ছে আমার ইলম ও হেকমতের দুষ্প্রাপ্যতা। সুতরাং কেউ যদি স্মরণকারী বংশ চায় তবে সে যেন এই পথই বেছে নেয়।'

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিচের কবিতাটিও সম্যক পরিচিত ও বিখ্যাত। যথা-

العلم نور وخير الناس تطلبه

يا طالب العلم لا تبغي به بدلا

والجاهلون لأهل العلم أعداء

الناس موتى وأهل العلم أحياء

'ইলম হচ্ছে নূর এবং কেবলমাত্র ভালো মানুষেরাই তা অন্বেষণ করে, হে তালেবে ইলম! ইলমের মোকাবেলায় তুমি অন্য কোনো বস্তু গ্রহণ করো না। আর জাহেলরা হচ্ছে আলেমদের দুশমন, সাধারণ মানুষ তো মৃত; কেবল জীবিত মানুষ হচ্ছেন আলেমগণ।'

তিনি ছন্দাকারে আরো বলেন,

ما الفخرُ إلا لأهلِ العِلْمِ إنَّهمُ   على الهدى لمن استهدى أدلَّاءُ

وقَدْرُ كلِّ امرىءٍ ما كان يُحْسِنُه   والجَاهِلُون لأهْلِ العلم أعَداءُ

ففُزْ بعلمٍ تَعِشْ حياً به أبداً   النَّاسَ موتى وأهلُ العِلْمِ أحْياءُ

'ফখর ও গৌরব তো একমাত্র আহলে ইলমেরই। কেননা তারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যারা হেদায়াতপ্রত্যাশী তাদের পথপ্রদর্শক। প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ঠিক ততটুকু, (নিজের ভেতর সে) যতটুকু ইলম স্থান দিয়েছে ও তাকে সুন্দর করেছে। আর জাহেলরা হচ্ছে আলেমদের শত্রু। তুমি ইলমের দ্বারাই সাফল্য লাভের চেষ্টা করো, তবে জীবন্তসত্তা হিসেবে জীবনযাপন করবে। সাধারণ মানুষ তো মৃত; আহলে ইলম কেবল জীবিত।'

আরেক কবি বলেন,

الناس من جهة التمثال أكفاء   أبـــوهمُ آدم والأم حواء

فإن يكـن لهم في أصلهم نسب   يفاخرون به فالطين والماء

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمُ   على الهدى لم استهدى أذلاء

'গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়ে সব মানুষই সমান, তাদের আদি পিতা আদম এবং আদি মাতা হাওয়া। যদি তাদের মূলে বংশীয় গৌরব থাকে, তবে সেই গৌরবের অধিকারী হচ্ছে মাটি এবং পানি। বরং

মর্যাদা কেবল আহলে ইলমের জন্যই, তারাই সুপথপ্রাপ্ত অপদস্তরাই সুপথ প্রার্থনা করে না।’

আরেক কবির ভাষায়-

العلم يرفع بيتاً لا عماد له ## والجهال يهدم بيت العز والشرف

العلم يسمو بقوم ذروة الشرف ## وصاحب العلم محفوظ من التلف

ياطالب العلم مهلاً لا تدنسه ## بالموبقات فما للعلم من خلف

‘ইলম স্তম্ভহীন ঘরকেও সমুন্নত করে, আর জাহেলরা ইজ্জত ও সম্ভ্রমের ঘর ভূলুণ্ঠিত করে। ইলম জাতির মর্যাদার চূড়া সমুন্নত করে, ইলমের অধিকারী ব্যক্তি ধ্বংস ও পতন থেকে নিরাপদ থাকে, হে ইলম প্রত্যাশী! কখনই তুমি ইলমকে কলঙ্কিত করো না ধ্বংসাত্মক বস্তু দ্বারা, কেননা ইলমের কোনো বিকল্প নেই।’

অন্য কবি বলেন,

العلم أنفس شيء أنت داخره

من يدرس العلم لم تدرس مفاخره

‘ইলম হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু যা তুমি সঞ্চয় কর! যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে তার মর্যাদা কখনও পদদলিত ও কলঙ্কিত হয় না।’

বিখ্যাত মুফাসসির ও অভিধানবিদ আল্লামা যমখশারী বলেন,

سَهَرِي لِتَنْقِيحِ العُلُومِ أَلَذُّ لِي ## مِنْ وَصْلِ غَانِيَةٍ وَطِيبِ عِنَاقِ

وتمايلي طرباً لحلِّ عويصةٍ في الدَّرْسِ ## أَشْهَى مِنْ مُدَامَةِ سَاقِ

وصريرُ أقلامي على أوراقها ## أحلى منَ الدَّكاءِ والعشاقِ

وَأَلَذُّ مِنْ نَقْرِ الفتاة لِدُفِّهَا ## نقري لألقي الرَّملَ عن أوراقي

‘ইলমের গবেষণায় রাত্রি জাগরণ আমার কাছে গায়িকা এবং মূল্যবান উষ্ট্রির চেয়ে আকর্ষণীয়; দরসের জটিল কোনো মাসআলা সমাধান করার বাসনা আমার কাছে সাকির শরাবের চেয়ে অধিক কাম্য ও সুস্বাদু। কাগজের পাতায় কলমের খসখসে আওয়াজ আমার কাছে প্রেমাস্পদের চেয়ে বেশি আনন্দের। আমার কাগজের ধূলোবালি দূর করার আঘাত গায়িকার দফে আঘাত করার চেয়ে বেশি শ্রুতিমধুর।’

আরেকজন কবি আলেমের অমরত্বের কাব্য গেয়েছেন নিচের কবিতায়-

أخو العلم حيٌ خالدٌ بعدَ موتِهِ ## و أوصالهُ تحتَ التُّرابِ رَمِيمُ

وذو الجهلِ مَيْتٌ وهو ماشٍ عَلَى الثَّرى ## يُظَنُّ مِنَ الأَحيَاءِ وهو عَديمُ

‘ইলমের বাহক মৃত্যুর পরও জীবিত, অমর। যদিও তার হাড়গোড় মাটির নিচে ছিন্নভিন্ন। পক্ষান্তরে জাহেলরা মৃত, যদিও সে ভূপৃষ্ঠে চলমান এবং খালি চোখে মনে হয় তারা জীবিত। কিন্তু বাস্তবে সে অস্তিত্বহীন।’

কোন্ ইলম শিক্ষা করা ফরয?

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু আভিধানের আশ্রয় নিয়ে কেউ কেউ অপব্যাখ্যা করেন। ইলম মানে জানা, ইলম মানে জ্ঞান- অভিধানের এই অর্থ গ্রহণ করে কৌশলে অনেকেই জাগতিক জ্ঞান ও সেই সাধনাকেও দীনের অংশ হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। একারণে বই-পুস্তকে, স্কুল-কলেজের দেয়ালে লেখা থাকে- 'প্রত্যেক নর-নারীর ওপর জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয।' কিন্তু আসলেই কি তাই? জাগতিক শিক্ষার জন্য কুরআন-হাদীছে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? বর্ণিত ফযীলতের কথা বলা হয়েছে? আদৌ তা নয়। বরং কুরআন-হাদীছ এবং দীনী বিষয়ের যে জ্ঞান সেটাকেই ইলম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সেগুলোরই ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ আল্লামা মুনাবী (রহ.) বলেন,

قد تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في هذا العلم المفروض على نحو عشرين قولاً وأجود ما قيل قول القاضي أن العلم المفروض هو ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الخالق جل وعلا ونبوة محمد ﴿ وكيفية الصلاة ونحوها فإن تعلمها فرض عين والظاهر أن المراد به كل ما يحتاجه المسلم من أمور العقيدة وشرائع الإسلام من حلال وحرام مما جاء عن النبي ﷺ

'এই ফরয ইলমের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী প্রায় বিশটি মত-অভিমত রয়েছে। তবে সবচেয়ে উত্তম মত হচ্ছে কাজী ইয়াদ্ব (রহ.)-

এর অভিমত। তা হচ্ছে; ফরয ইলম হচ্ছে যা শিক্ষা করার বিকল্প নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হাসিল করা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হাসিল করা, সালাত ও অন্যান্য বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এসব ইলম হাসিল করা ফরযে আইন। মোটকথা হচ্ছে, জরুরী আকীদা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের প্রতিটি বিধান যথাযথভাবে জানার জন্য মুসলিম যে ইলমের মুখাপেক্ষী সেটাই ফরয ইলম হিসেবে বিবেচিত।

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ »

'ইলম শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয।' [ইবন মাজাহ: ২২৪]

এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম লিখেন-

فأشرف العلوم ثمرة العلم بالله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله وما يعين عليه فإن ثمرته السعادة الأبدية

'সর্বশ্রেষ্ঠ ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে জ্ঞান হাসিল হওয়ার ইলম, তাঁর ফেরেশতা, রাসূল এবং এগুলোর সহায়ক ইলম। কারণ এর ফল হলো অনন্ত সৌভাগ্য।'

হাসান ইবন রবী' (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم قال: ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه

'ইলম শিক্ষা করা ফরয' দ্বারা সেই ইলম উদ্দেশ্য নয়, মানুষ যা (জাগতিক স্বার্থে) হাসিল করে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দীনের প্রয়োজনের ইলম।'

ইলমের পথে চলে কোনো কারণে কাঙ্ক্ষিত ইলম হাসিল করতে না পারলেও ছাওয়াব

ইলমের রাস্তা এমন এক বরকতময় রাস্তা যে, এখানে ব্যর্থতা বলতে কোনো কিছু নেই। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি ইলম হাসিল করতে এসে কোনো কারণে ব্যর্থও হয়, তথাপি তার জন্য ছাওয়াব রয়েছে। স্কুল-কলেজে তো পাশ করতে না পারলে কয়েক বছরের শ্রম একেবারেই বৃথা যায়। পরীক্ষার আগের সমস্ত লেখাপড়াকে ব্যর্থ ও মূল্যহীন আখ্যায়িত করা হয় পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার খাজানা এবং দানের ভাণ্ডার এত বিস্তৃত যে, তিনি দ্বীনী ইলম শিখতে আসা কাউকে বঞ্চিত করেন না। বরং একনিষ্ঠতার সঙ্গে কেউ ইলম শিখতে এসে যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয় আল্লাহ তা'আলা তাকেও তার নিয়তের বদৌলতে ছাওয়াব দান করেন।

ইলমের ধারাবিন্যাস

পূর্বসূরীগণ ইলমের চমৎকার একটি ধারাবিন্যাস উল্লেখ করেছেন। যথা-

وقيل أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره

'ইলমের প্রথম অংশ নীরবতা, তারপর কান পেতে শ্রবণ করা, এরপর হিফজ করা, অতপর আমল করা এবং তারপর ইলমের প্রচার-প্রসার ঘটানো।'

ইলম অর্জন করার পদ্ধতি

ইলম হাসিল করার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু হিকমত ও কৌশল আছে। ইলম হাসিল এবং নিজের মধ্যকার অজ্ঞতা দূর করার সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায় হচ্ছে সংকোচ দূর করা। যেমন, পূর্বসূরীরা বলে থাকেন-

وقيل علِّم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم ما تجهل فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت

'প্রথমে যে ব্যক্তি জানেন না তাকে আপনার ইলম দান করুন। আর আপনি যা জানেন না, তা যিনি জানেন তার কাছ থেকে শিক্ষা করুন। যদি এরূপ করেন তবে আপনি যে বিষয়ে অজ্ঞ সে আপনার ইলম হাসিল হবে এবং যা জানেন না তাও আয়ত্বে থাকবে।'

ইলম শিখতে এসে যারা ফিরে গেছে তারা চরম ব্যর্থ হয়েছে

অনেকে ইলম হাসিল করতে আসে না। আর কেউ কেউ এসেও নানা কারণে ঝরে পড়ে। সাবধান! অমন দুর্ভাগা যেন আমরা কেউ না হই। যারা ইলম শিখতে আসে না কিংবা এসেও কোনো কারণে ফিরে যায়, পৃথিবীতে তাদের চেয়ে হতভাগা কোনো লোক নেই। কথাটির সত্যতা পাওয়া যায় একটি হাদীছে। তাতে এসেছে,

بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ مر ثلاثة نفر فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر من ورائهم وانطلق الثالث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر قالوا بلى يا رسول الله قال أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله والذي جلس من ورائكم فاستحى فاستحى الله منه وأما الذي انطلق رجل أعرض فأعرض الله عنه

একবার তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। সে সময় তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ইলম শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনজনের একজন মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজের প্রয়োজনে চলে যায়, দ্বিতীয়জন মজলিসের মাঝখানে জায়গা পেয়ে সেখানে বসে পড়েন এবং ইলমের মজলিসে বসার কারণে ফেরেশতাদের দু‘আ, আল্লাহ তা‘আলার রহমত এবং সমস্ত প্রাণীর দু‘আ লাভের সৌভাগ্য হাসিল করেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে লজ্জা করেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ভীড় ঠেলে বসতে সংকোচবোধ করেন। ফলে

আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি রহমতের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন অর্থাৎ তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করেন[4]।

এর দ্বারা বোঝা গেল, ইলমের মজলিসে ভীড় ঠেলে হলেও বসা নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে লজ্জা বা সংকোচবোধ করা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি, ইলমের মজলিসে বসা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাপ্রাপ্তির মাধ্যম। পক্ষান্তরে ইলমের মজলিস ত্যাগ করা পরম বঞ্চনা ও ব্যর্থতার লক্ষণ।

তাছাড়া ইলম ও যিকিরের মজলিস পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ٣٦ ﴾[الزخرف: ٣٦]

'যারা দয়াময়ের যিকির ও স্মরণ থেকে দূরে সরে যায় আমি তাদের জন্য একজন শয়তানকে নির্দিষ্ট করি। ফলে সে তার সঙ্গী হয়ে যায়।' {সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩৬}

ইলম হাসিলের সহায়ক

ইলমের অনেক ফযীলত। সীমাহীন এর গুরুত্ব। পূর্বোক্ত বর্ণনা ও

---

[4] মুসনাদে আহমাদ ৫/২১৯।

আলোচনায় তা স্পষ্ট হলো। কিন্তু কীভাবে তা হাসিল হবে? ইলম কী খুব সহজেই হাসিল হয়? কোনো কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করা ছাড়া? না, ইলম হাসিলের জন্য অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা করতে হয়। সময় ব্যয় করতে হয়। শ্রম দিতে হয় এবং অনেক গুণের অধিকারী হতে হয় কিংবা নিজের মধ্যে গুণ সৃষ্টি করতে হয়। বুযুর্গানে কেরাম ইলম হাসিলের জন্য ছয়টি গুণ আবশ্যক বলেছেন। যথা-

এক. মেধা। মেধা এমন এক বস্তু, যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে কমবেশি বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা একেবারে মেধাশূন্য কোনো মানুষ সৃষ্টি করেননি। কম হোক বেশি হোক প্রত্যেকের মধ্যেই মেধা আছেই। এটাই আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ। একেবারে মেধাশূন্য করে তিনি কোনো বান্দার প্রতি বে-ইনসাফ করেন নি। সুতরাং যারা মেধাশূন্যতার দোহাই দেয় তারা ভুল করে এবং ভুল বিশ্বাসের সঙ্গে বাস করে।

দুই. ইলম অন্বেষণের প্রতি তীব্র বাসনা থাকা। সুতরাং ইলম শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীনির কর্তব্য হচ্ছে ইলম অন্বেষণের প্রতি তীব্র বাসনা ও আগ্রহ রাখা। ইলমের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উদগ্রীব থাকা। ইলম শিক্ষার জন্য ছোটো-বড় সকলের শরণাপন্ন হওয়া। ইলমের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা এবং সর্বোচ্চ মেধা খরচ করা।

তিন. ইলম হাসিলের জন্য সবর, ত্যাগ ও মুজাহাদা করা। একজন তালেবে ইলমের জন্য এই গুণ খুবই জরুরী। এই গুণ অর্জন করা

ছাড়া কেউ তালেবে ইলম হওয়ারই যোগ্যতা রাখে না। ইলম তো সবর ও চেষ্টার অপেক্ষায় থাকে। তাই এই গুণ দুটি ছাড়া ইলম হাসিলে সাফল্য লাভ করার কল্পনা করা বৃথা চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

তালেবে ইলমের জন্য চাই অপরিসীম সবর ও ধৈর্য। মনে রাখতে হবে, ইলমের পথ সংক্ষিপ্ত নয়। বরং দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েই কেবল ইলম সাধনায় সফলতা পাওয়া যায়। ইলমের পথপরিক্রমা তো সেই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত! এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে কিঞ্চিত কষ্ট বরদাশত করতে হবে না! নফসকে দমন করতে হবে না!

ইলম অন্বেষণে নফসকে দমন ও কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত করার জন্য দুইভাবে সবর ও ধৈর্য্যরে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। **প্রথমত.** এ কথার শিক্ষা যে, ইলম হচ্ছে ইবাদত। আর প্রতিটি ইবাদত পালনেই কষ্ট স্বীকার করতে হয়। **দ্বিতীয়ত.** ইলম শিক্ষার পথপরিক্রমায় অহর্নিশ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে থাকা।

কী রকম ধৈর্য? শুধু পাঠকক্ষে উপস্থিত হওয়ার কষ্ট স্বীকারের ধৈর্য? না। শুধু উস্তাদগণের সান্নিধ্যে থাকার ধৈর্য? না। দরসের পড়া শ্রবণ ও তা ধরে রাখার ধৈর্য? না। শুধু এসব বিষয়ের ধৈর্যই যথেষ্ট নয়। বরং ইলম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এধরনের যাবতীয় বস্তু থেকে দূরে থাকাই হচ্ছে ইলম হাসিলে ধৈর্যধারণ করা। যুবক ও তরুণদের জন্য এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কেননা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা পথ হারিয়ে ফেলে। যুগের নানা রকম আহ্বান

তাদেরকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে। তাই তাদেরকে ইলমের পথে টিকে থাকার জন্য অপরিসীম ধৈর্যধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইলম শিক্ষা করতে এসে কিছুটা কষ্টের সম্মুখীন না হলে, ত্যাগ স্বীকার করতে না পারলে পরবর্তী জীবনে সফলতা পাওয়া যায় না।

ইবন আতাউল্লাহ (রহ.) বলেন,

من كانت بداياته محرقة قوية كانت نهاياته مشرقة.

'যার শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় কষ্টের তার শেষ জীবন হয় উজ্জ্বল।'

বস্তুত ইলমের গভীরতা ও সূক্ষ্ম ইলম হাসিল করতে হলে কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। মনে রাখা চাই, ইলম সাধারণ ওয়াজ-নছিহত নয় যে, যেখান সেখান থেকে, যেভাবে সেভাবে সংগ্রহ করা যায়। বরং খাঁটি ইলম সংগ্রহ করতে হলে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে এবং কষ্ট স্বীকারে ধৈর্যও ধারণ করতে হবে। ইবন মুবারক (রহ.)-এর কথায় এই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন-

إذا رأيت موعظة، أو إذا مررت بجدار فرأيت مكتوبا عليه موعظة، فقف عندها لتتعظ؛ ولكن الفقه في الدين إنما يكون بالمشافهة والسماع

'যদি কোথাও ওয়াজ শুনতে পাও অথবা পথ চলতে দেয়ালের গায়েও উপদেশ বাক্য লেখা দেখতে পাও তবে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যাও এবং নছিহত গ্রহণ করো। কিন্তু মনে রেখো, দীনের ফিকহ হাসিল করা এরকম সহজ নয়। বরং তা সরাসরি ও উস্তাদের কাছে শ্রবণ করে হাসিল করতে হয়।'

এই বাণীতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মানুষ সাধারণ ওয়াজ-নছিহত, আদেশ-উপদেশ সুযোগ অনুযায়ী যে কোনো স্থান থেকেই হাসিল করতে পারে। কিন্তু ইলম হাসিলের বিষয়টি আদৌ এমন নয়। বরং এর জন্য ত্যাগ স্বীকার ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় এবং কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়। নফসের সঙ্গে তুমুল লড়াই করতে হয়। আরো মনে রাখা উচিত, কেউ যদি ইলম হাসিলের জন্য নিজেকে দীর্ঘদিন আবদ্ধ না রাখে, ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তবে তাকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে। ইলমের ভাণ্ডার থেকে মাহরুম হবে। উদাহরণস্বরূপ মূসা (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি খিযির (আ.)-এর সঙ্গে বেশিদিন অবস্থান করার ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি বলে তিনি বেশি উপকৃত হতে পারেননি এবং এ কারণে আমরাও অনেক ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا أَنَّهُ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا

'আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর ওপর রহম করুন। আক্ষেপ, তিনি যদি আরেকটু ধৈর্যধারণ করতেন তবে আমরা তাদের আরো অনেক কিছু জানতে পারতাম।' [বুখারী: ১২২; মুসলিম: ১৭০]

বর্ণিত আছে-

لو صبرتَ لأتيتُ بك على ألفي عجيبة، كلها مما رأيت

'খিজির (আ.) বললেন, আপনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন তবে আমি আপনার সামনে আমার দেখা দুই হাজার বিস্ময়কর ও হেকমতপূর্ণ ঘটনা পেশ করতাম।' [তাফসীর আল-বাহরুল মাদীদ: ১১/২৭৭]

সুতরাং সবর করতে হবে এবং দীর্ঘসময় নিয়ে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতে হবে। এমনকি ঘরে-বাইরে, সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বদা ইলমেরই চর্চা করতে হবে। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, আমি আমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে থাকার সময়ও আমার সামনে মাসআলা হাজির হয় এবং আমি ইলমী বিষয়ে মশগুল থাকি।

আমাদের পূর্বসূরীগণের অনেকেই ইলম হাসিলে এত বিমগ্ন থাকতেন যে, এ কারণে কেউ হয়ত বিবাহই করেননি, আবার কেউ অনেক বিলম্বে বিয়ে করেছেন।

আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (রহ.) 'আল-উলামাউল উয্যাব' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে ইসলামী ইতিহাসের বহু বিখ্যাত মনীষীর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে, যারা শুধু দীনী ইলম হাসিল এবং তা মানুষের মধ্যে বিস্তারের জন্যই বিবাহের পার্থিব সুখানন্দ থেকে নিজেদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত রেখেছেন।

এছাড়াও অনেক মাশায়েখ শুধু ইলম হাসিলের স্বার্থে বিয়েশাদী বিলম্ব করতেন। যেমন, বিখ্যাত মনীষী আল্লামা ইবন রজব হাম্বলী রহ. (৭৯৫ হি.)। তিনি ইলম হাসিলে এত বিমগ্ন ছিলেন যে, অনেক বয়স হওয়ার পর তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল। আর বিয়ের দিনেও মুতালা'আ বা অধ্যয়ণ এবং জ্ঞানসাধনায় এত মগ্ন ছিলেন যে, স্ত্রী

সেজেগুজে, সুগন্ধি মাখিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর পরও তিনি টের পেলেন না। তিনি স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাতের ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন, অনেকক্ষণ পর আমি তার দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে নজর দিয়েছিলাম। এরপর তিনি স্ত্রীর কিছু বিবরণ দেয়ার পর বলেন, অতপর আমি কিতাবের দিকে মনোনিবেশ করলাম এবং অসমাপ্ত পড়া শেষ করলাম। কিন্তু স্ত্রী এতে দারুণ ক্রুদ্ধ হলো এবং সেখান থেকে চলে গেল।

বস্তুত তারা নিজেরাও জানেন, যে ব্যক্তি যে হকের অধিকারী তাকে সেই হক প্রদান করা জরুরী। কিন্তু কখনও কখনও এই বাস্তবতার ওপর মানুষের স্বভাব প্রবল হয়ে ওঠে এবং যে যেভাবে জীবন গড়ে তুলেছে তার মধ্যে সেই বস্তু প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যেহেতু ইবন রজব হাম্বলী (রহ.) সারা জীবন গ্রন্থ অধ্যয়ণ ও জ্ঞানসাধনায় মগ্ন থেকেছেন, একারণে বাসর রজনীতেও নববধূর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কথা ভুলে গেছেন এবং সারা জীবনের সঙ্গী কিতাবপত্রের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন! অনেকে তো কিতাবাদির সঙ্গে এত সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেন যে, রাতে শোয়ার সময় শিয়রে বইপত্র ও অধ্যয়নের সামগ্রী নিয়ে শুতেন!

চার. পানাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমান সময়ে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তাতে সকলের জন্য এই শর্ত সহজ এবং ইলম শিক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত খরচাদির অনকূল ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

পাঁচ. যোগ্য ও স্নেহপ্রবণ উস্তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ। সার্বক্ষণিক উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে ইলম হাসিল করতে হবে। মনে রাখতে হবে, উস্তাদ ছাড়া শুধু বই-পুস্তক ঘেঁটে আলেম হওয়া যায় না।

ছয়. ইলম অন্বেষণের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করা, দ্রুততা অবলম্বন না করা। একজন খাঁটি আলেম হতে হলে অবশ্যই তাকে সময় দিতে হয়। সাধনা করতে হয়। ইলম তো মেশিনে প্রাপ্ত কোনো বস্তু নয় যে, সকালে ঢুকে বিকেলে আলেম হয়ে বের হওয়া যাবে! ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) বলতেন,

ومن أراد العلم جملة ذهب عنه جملة

'যে ব্যক্তি একসঙ্গে সব ইলম পেতে চায় তার সব কিছু একসঙ্গে হারিয়ে যায়।'

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এক কবিতায় এই ছয়টি বস্তুকে একত্রিত করেছেন। যথা-

أخي لن تنال العلم إلا بستة □□□ سأنبيك عنـــــها ببيان

ذكاء وحرص وافتقار وغربة □□□ وتلقين أستاذ وطول زمان

'ভাই! ছয়টি বস্তু ছাড়া তুমি ইলম হাসিল করতে পারবে না। আমি তোমাকে সেই ছয়টি বস্তু বর্ণনা করে শোনাবো। মেধা, বাসনা, আগ্রহ, সফর, উস্তাদের সাহচার্য এবং দীর্ঘ সময় ব্যয়।'

জনৈক ফার্সি কবির ভাষাতেও এই ছয়টি গুণের কথা প্রকাশিত হয়েছে। যথা-

علم را هر گز نیابی تا نه داري شش خصال

حرص قطع فهم كامل جمع خاطر كل حال

خدمت استاذ باید هم سبق خواني مدام

لفظ را تحقيق كنی تا شوي مرد كمال

‘তুমি ছয়টি গুণ ছাড়া কিছুতেই ইলম পাবে না। তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূর্ণ বোধ, সর্বাবস্থায় মনসংযোগ, শিক্ষকগুরুর সেবা, সর্বোপরি সারাক্ষণ অধ্যয়নে অভিনিবেশ আর শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বুঝে পাঠ- এসব বৈশিষ্ট্য আমলে নাও যাতে তুমি একজন পরিণত মানুষ হতে পার।’

ইলমের অন্তরায়

ইলম অমূল্য সম্পদ, সীমাহীন এর গুরুত্ব। আর দুনিয়ার নিয়মই এমন, যে বস্তু যত মূল্যবান তা ততই গুরুত্বের দাবি রাখে এবং মানুষ তা হাত ছাড়া না হওয়ার নানা রকম উপায় অবলম্বন করে। সে হিসেবে ইলম অর্জনে সহায়ক অনেক পন্থাও যেমন অবলম্বন করতে হয় তেমনিভাবে ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধক অনেক পন্থাও পরিহার করতে হয়। আসলে যুগ ও সময়ের হাওয়ায় প্রতিবন্ধকতার নতুন নতুন উপসর্গ যোগ হয়। তাই যুগ ও সময়ের বিচার ও মূল্যায়ন করে ইলমের অন্তরায় যাবতীয় বিষয়াদি থেকে আমাদের

দূরে থাকতে হবে। নিম্নে ইলমের প্রতিবন্ধক কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। আশা করি আমরা সকলে এসব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অন্তরায়: ইলমের মর্ম সম্পর্কে অবহিত না হওয়া

ইলমের প্রতিবন্ধকতার একটি হচ্ছে, ইলমের মর্ম সম্পর্কে অবহিত না হওয়া। অর্থাৎ ইলম যে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ তার মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়া। অনেকে ইলম হাসিল করতে আসে বটে কিন্তু এর মূল্য অনুধাবন করতে পারে না। সে মনে করে ইলম নিতান্তই মামুলি বস্তু এবং এর উপকারিতা সামান্য। বরং কেউ কেউ তো চরম হীনমন্যতায় ভোগে একথা ভেবে যে, ধর্মহীন জাগতিক শিক্ষায় ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সুযোগ বেশি। কিন্তু এখানে তো এর কিছুই নেই! এসব ভেবে নিজেকে একেবারে মূল্যহীন এবং ইলমকে স্বল্পদামী জ্ঞান করে। যার চূড়ান্ত পরিণাম হচ্ছে ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া।

দ্বিতীয় অন্তরায়: নিয়তে ত্রুটি

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো নিয়তে ইলম অন্বেষণ করা। এটা তো বলাইবাহুল্য যে নিয়ত ঠিক না হলে কোনো নেক কাজই মূল্যবান হয় না। উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »

‘নিশ্চয় আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্য তাই থাকবে যা সে নিয়ত করবে।’ [বুখারী: ১]

আমলের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم . ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم ، فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا ، هم آخرته ، كفاه الله هم الدنيا ، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا ، لم يبال الله في أي أوديتها هلك

‘আহলে ইলম যদি ইলম হেফাজত করতেন এবং যথাস্থানে তা রাখতেন তবে তারা যুগের নেতৃত্ব লাভ করতে পারতেন। কিন্তু ইলমকে পার্থিব স্বার্থে ব্যবহৃত করার ফলে ক্ষমতাসীনরা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। আমি তোমাদের নবীর মুখে শুনেছি। যে ব্যক্তি আখেরাতকে একমাত্র ফিকিরের বস্তু বানাবে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পেছনে ছোটে সে যে উপত্যকায় ধ্বংস হোক তাতে আল্লাহ তা‘আলা কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ করবেন না।’

সুতরাং তালেবে ইলমের একমাত্র নিয়ত হতে হবে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি। অন্যথায় তা বিপদের কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শিক্ষা করা হয় যে ব্যক্তি এমন ইলম শিক্ষা করবে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ অর্জনের নিমিত্তে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না।' [আবূ দাঊদ: ৩৬৬৪, সহীহ]

আতা রহ. বলেন,

جعل الله العلم الذى علمه من هذا وصفه حجة عليه ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه

'আল্লাহ যে ইলম শিখিয়েছেন একে, তিনি তা বান্দার বিপক্ষে দলিল বানিয়েছেন। যে ব্যক্তি দুনিয়া উপার্জন ও তাতে মর্যাদা লাভের জন্য ইলম হাসিল করে সে ওই ব্যক্তির মতো যে ইয়াকুত পাথরের চামচ দিয়ে ময়লা ওঠায়। আহ্! মাধ্যম কত মর্যাদার আর তা দ্বারা ওঠানো বস্তু কত নগণ্য!

সুহনুন বলেন, ইবনুল কাসেম আমাদেরকে বারবার বলতেন,

اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر يعني العلم مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহভীতির সঙ্গে এই জিনিস তথা ইলম সামান্যও অনেক। পক্ষান্তরে আল্লাহভীতি ছাড়া অনেক ইলমও সামান্য।'

হাম্মাদ ইবন সালামা বলেন,

العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص ، والإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل

‘ইলম নির্ভর করে আমলের ওপর। আর আমল নির্ভর করে ইখলাসের ওপর। ইখলাস এমন বস্তু, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বান্দার মধ্যে সমঝ সৃষ্টি করে।’

তৃতীয় অন্তরায়: ইলম ও উস্তাদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করা

ইলম থেকে বঞ্চিত এবং তা থেকে উপকৃত হতে ব্যর্থ হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, ইলম ও উস্তাদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করা। অতীত ও বর্তমানে এধরনের বহু ঘটনার উদাহরণ পাওয়া যায়। ইলম ও উস্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু দরসের সময়ের সঙ্গে নয়; বরং আজীবন তা বজায় রাখতে হয়। আর শিক্ষা সমাপনের পর কিংবা পড়াশোনার সময়েও এক দরস থেকে আরেক দরসের মাঝখানে যে বিশাল সময় থাকে তা অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় কিংবা গালগল্পের মধ্যে কাটিয়ে দিলে আস্তে আস্তে ইলমের মহব্বত ও আকর্ষণ কমে যায়। এভাবে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে জাগতিক কাজে। এভাবে ইলমের প্রতি অমনোযোগীতা ও বিকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যা তাকে শেষ পর্যন্ত পথহারা করে ছাড়ে। অনেক মেধাবী ছাত্রের শুধু একারণে ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আজ আমাদের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, রাস্তাঘাটে সাধারণ লোকদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করা, অপ্রয়োজনে রাস্তার পাশে বসে

চা খাওয়ার নামে প্রচুর সময় ব্যয় করার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী পুণ্যবানদের অবস্থা কি তাই ছিল? ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, তারা শুধু ইলমের জন্য দুনিয়ার হাজার রকমের স্বাদ-আহ্লাদ ও সুখকর বস্তু পরিহার করে চলেছেন। তারা ইলমের মধ্যে এত স্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন যে যাবতীয় পার্থিব সুখকে তারা দু'পায়ে মাড়াতেন আকুণ্ঠচিত্তে। জনৈক কবি এক আলেমের শানে এরূপ একটি ঘটনার কাব্যিক বিন্যাস করেছেন। একবার এক সুন্দরী ও চরিত্রবান দাসী আসল এক আলেমের কাছে। কিন্তু তিনি তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বরং বললেন-

فقلت ذريني واتركيني ## ولي في طلاب العلم والفضل والتقى

فإنّني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها ## غنى عن غناء الغانيات وعرفها

'আমাকে ছাড়ো। আমার তো ইলম অন্বেষণ ও ইলমচর্চার কাজ রয়েছে। আমি ইলম অর্জন ও এর রহস্য উদঘাটনেই ব্যস্ত থাকতে বেশি পছন্দ করি। আর এটাই আমার জন্য গায়িকার গান এবং দাসীর সঙ্গস্বাদ পূর্ণ করে দেয়।'

মোটকথা, ইলমের স্বাদ ও পিপাসা স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত না করা পর্যন্ত অন্যদিকে মনোনিবেশ করা যাবে না। এভাবে অভ্যাস গড়ে উঠলে একদিন এমন আসবে, যেদিন দুনিয়ার হাজারও পার্থিব উপকরণ সামনে আসা সত্ত্বেও সেদিকে মন যাবে না।

নিঃসন্দেহে এটি একটি কঠিন কাজ। কিন্তু রোগ তো সারাতে হবে! মানুষ রোগমুক্তির জন্য কত সুখ সম্ভারই না ত্যাগ করে! সুস্বাদু খাবার, প্রভাতের মৃদমন্দ স্নিগ্ধ ও কোমল হাওয়ায় সুখকর ঘুম ত্যাগ করে ব্যায়াম করে, আরো কত কি! তবে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের মহা রোগ মূর্খতার জন্য কেন তুমি কিছু কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না? আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, 'মূর্খতা এমন এক রোগ, যা রোগীকে কখন খুন করে ফেলে তা রোগী নিজেও টের পায় না।' তিনি আরো বলেন,

والجهل داء قاتل وشفاؤه　　علم من القرآن أو من سنة

أمران في الترتيب متفقان　وطبيب ذاك العـــــالم الرباني

'মূর্খতা হচ্ছে খুনী রোগ। আর এর শেফা হচ্ছে সর্বসম্মতভাবে দুটি বিষয়, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম। আর ডাক্তার হচ্ছেন আলেমে রব্বানী।'

চতুর্থ অন্তরায়: আমল তরক করা

ইলমের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আমল। সুতরাং আমলহীন ইলম অর্থহীন এবং বিপদের কারণ। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

‘আবূ বারযা আসলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন বান্দা একচুল কদম সরতে পারবে না যাবৎ না তাকে (চারটি প্রশ্নের উত্তর) জিজ্ঞেস করা হয়: তার হায়াত সম্পর্কে, কীসে তা বিলিয়ে দিয়েছ; তার ইলম সম্পর্কে, কোথায় সে আমল করেছে; তার সম্পদ সম্পর্কে, কোত্থেকে সে উপার্জন করেছে এবং কোথায় সে ব্যয় করেছে এং তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে তা পুরনো করেছে।’ [তিরমিযী: ২৪১৭, সহীহ]

ফুযাইল ইবন ইয়াদ্ব বলেন,

لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به ، فإذا عمل به كان عالما

‘ইলম অনুযায়ী আমল না করলে ওই ব্যক্তি জাহেল। যখন আমল করবে কেবল তখনই সে আলেম বলে গণ্য হবে।’

ইমাম শা‘বী (রহ.) বলেন,

كنا نستعين علي حفظ الحديث بالعمل به ، وكنا نستعين على طلبه بالصوم

‘আমরা হাদীছ মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তদনুযায়ী আমলের মাধ্যমে সহযোগিতা নিতাম আর তা অর্জনে সহযোগিতা নিতাম সাওম পালনের।’

সাহাবায়ে কেরাম দশটি আয়াত শিখলে আগে সেগুলোর ওপর আমল করে পরে অন্য আয়াত শিখতেন।

ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন,

والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة

‘নিঃস্ব ও সম্পূর্ণ মিসকিন ওই ব্যক্তি, যে সারা জীবন এমন ইলমের জন্য ব্যয় করল যার ওপর আমল করা হলো না। ফলে সে দুনিয়ার স্বাদ থেকেও বঞ্চিত হলো আখেরাতের কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হলো।’

পঞ্চম অন্তরায়: শুধু কিতাবের ওপর ভরসা করা

কোনো কোনো তালেবে ইলম ধারণা, উস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাব থেকেই ইলম হাসিল করা যায়। এ ধরনের ধারণা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। উস্তাদের সাহচর্য, সান্নিধ্য ও দিকনির্দেশনা ছাড়া ইলম হাসিলের কল্পনাই করা যায় না। পূর্বসূরী পূর্বসূরীগণ বিভিন্ন ভাষায় এ ধরনের ধারণার নিন্দা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام

‘যে ব্যক্তি কিতাবের পেট থেকে জ্ঞানে প্রাজ্ঞতা অর্জন করে সে বিধানাবলিকে ধ্বংস করে ছাড়ে।’

ফকিহ সুলায়মান মূসা বলেন,

كان يقال: لا تأخذوا القرآن من المصحفين ، ولا العلم من الصحفيين

‘বলা হতো, লিপিকার থেকে কুরআন এবং কিতাবের পাতা থেকে তোমরা ইলম গ্রহণ করো না।’

সাঈদ ইবন আবদুল আযীয তানূখীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

لا تحملوا العلم عن صحفي ، ولا تأخذوا القرآن من مصحفي

‘তোমরা লিপিকার থেকে (কুরআনের) বিদ্যা তালাশ করো না আর কিতাবের পাতা থেকে কুরআন গ্রহণ করো না।’

জ্ঞানীগণ বলেন,

من كان شيخه كتابه ، كان خطؤه أكثر من صوابه

‘যার শিক্ষক হলো শুধু কিতাব, তা সঠিকের চেয়ে বেঠিকই বেশি।’

ষষ্ঠ অন্তরায়: শুধু নবীনদের ইলমে ভরসা করা

প্রতিবন্ধকতার আরেকটি বিষয় হচ্ছে অভিজ্ঞতাহীন নবীনদের থেকে ফিকহ-ফাতাওয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ ইলম হাসিল করা। বস্তুত অভিজ্ঞতা এবং বয়সের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে, যা নবীনদের মধ্যে অনুপস্থিত। এর প্রভাব পড়ে তার ইলম ও কথাবার্তাতেও। তাই পূর্বসূরীগণ নবীনদের কাছ থেকে ফিকহ-ফাতাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ইলম হাসিল করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَعَنْ أُمَنَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ ، فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا

‘যতদিন মানুষ ইলম অর্জন করবে নিজেদের প্রবীণ, বিশ্বস্ত ও আলেমদের কাছ থেকে, তারা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে। আর যখন ইলম গ্রহণ করবে নবীন ও অশিষ্টদের কাছ থেকে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।’ [বাইহাকী, মাদখাল: ২৭৫]

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ» .

‘আবূ উমাইয়া জুমাহি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের আলামত নিদর্শনের অন্যতম হলো নবীনদের কাছ থেকে ইলম তালাশ করা।’ [জামে ছগীর: ২২০৩; সহীহ]

অবশ্য নবীনের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবন কুতায়বা বলেন, এর দ্বারা বয়সে নবীন উদ্দেশ্য। কেননা শায়খের বয়সের বালখিল্যতা, ত্বরাপ্রবণতা, বোকামি, লালসা, শয়তানী পদস্খলন ইত্যাদি স্বভাব দূরীভূত হওয়ার ফলে তার মধ্যে গভীরতা ও গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়। যা ইলমের গাম্ভীর্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا

‘ফিকহ যখন প্রবীণ থেকে আসে আর নবীন তার অনুগমন করে তখন উভয়ে পথপ্রাপ্ত হয়।’

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كبارکم ، فإن كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير

'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলম থাকবে প্রবীণদের মধ্যে। আর ইলম যদি নবীন থেকে প্রবীণের দিকে আসে তখন নবীন প্রবীণকে বোকা বানিয়ে দেয়।'

অবশ্য এই বক্তব্য সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়। বরং কোনো নবীন যদি সত্যিকার অর্থেই যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা এবং ইলমী মাকাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তবে তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করাতে দোষ নেই। সাহাবী-তাবেঈদের মধ্যে অনেক নবীন প্রবীণের চেয়েও ইলমী অবস্থানে বেশি এগিয়ে ছিলেন। ফলে তাদের কাছ থেকে আগ্রহ ও প্রতিযোগিতার সঙ্গে ইলম হাসিল করা হতো। অতএব, নবীনদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেককে যথাযথ স্থানে আসন দেয়া। সুতরাং নবীন ও প্রবীণদেরকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করা খুবই প্রয়োজনীয়।

সপ্তম অন্তরায়: ইলম অন্বেষণে ত্বরাপ্রবণতা

প্রতিবন্ধকতার আরেকটি হলো ত্বরাপ্রবণতা বা ত্বরিতমনস্কতা। অর্থাৎ ন্যূনতম ও স্বল্প সময়ের মধ্যে বড় আলেম হতে চাওয়া। অল্প সময় ব্যয় করে মুফতি বা মুহাদ্দিস হতে চাওয়া। অথচ এটি ইলম হাসিলের সরলপথ নয়, বরং বক্রপথ। কারণ, ইলম একদিনে হাসিল হওয়ার বস্তু নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর

বছর এবং এভাবে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিতে হয় ইলম হাসিলের জন্য। কেননা মানুষ যখনই সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করে এবং তাতে সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয় তখনই পথচ্যুত হয়, ইলম হাসিলের পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নামে। সুতরাং বলা যায়, ইলম অন্বেষণের বড় অন্তরায় হচ্ছে ধীর-সুস্থতা অবলম্বন না করা। অল্প সময়ে সবকিছু শিখে ফেলার প্রবণতা। দুই-চার বছর খরচ করে মাওলানা মুফতি হয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করা। কেননা ইলমের রীতি হচ্ছে পর্যাপ্ত সময় ও শ্রম ব্যয় করে এবং ধীরতা অবলম্বন করে তা অর্জন করতে হয়। কুরআনেও বারবার নবীকে এই সুন্নত বা রীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত-

﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾ ﴾ [الاسراء: ١٠٦]

‘আর কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে।’ {সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৬}

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন-

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾ [الفرقان: ٣١]

‘আর কাফিররা বলে, ‘তার উপর পুরো কুরআন একসাথে কেন নাযিল করা হল না? এটা এজন্য যে, আমি এর মাধ্যমে তোমার

হৃদয়কে সুদৃঢ় করব। আর আমি তা আবৃত্তি করেছি ধীরে ধীরে।’ {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩১}

এসব আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধীরতা অবলম্বন এবং সময়ক্ষেপণ করে কুরআন হাসিল করার আদেশ করেছেন।

অষ্টম প্রতিবন্ধকতা: অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও আত্মতুষ্টি

ইলমের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পাপ। আর সবচেয়ে পাপ হচ্ছে অহংকার, দাম্ভিকতা। সুতরাং ইলম অন্বেষণ করতে চাইলে অন্যান্য যাবতীয় পাপের সঙ্গে সঙ্গে এই মারাত্মক পাপগুলোও পরিহার করতে হবে। কুরআনে এই পাপের নিন্দা করে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٖ فَخُورٖ ١٨ ﴾ [لقمان: ١٨]

‘আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।’ {সূরা লুকমান, আয়াত: ১৮}

ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতের চূড়ান্ত সফলতা। আর সফলতার পথে বড় বাধা অহংকার ও দাম্ভিকতা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝٨٣ ﴾ [القصص: ٨٣]

'এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।' {সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৩}

আলী ইবন ছাবেত (রহ.) বলেন,

العلم آفته: الإعجاب والغضب ++ والمال آفته: التبذير والنهب

ইলমের আপদ হলো আত্মতুষ্টি ও ক্রোধ। আর সম্পদের আপদ অপচয় ও ছিনতাই।

আইউব সিখতিয়ানী (রহ.) বলেন,

ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لله

'তালেবে ইলমের কর্তব্য হচ্ছে বিনয় প্রকাশ করে মাথায় মাটি তুলে রাখা।'

জনৈক হাকিমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের কোন্ নিয়ামতের ওপর ঈর্ষা করা যেতে পারে? 'জবাবে তিনি বললেন, বিনয়ের জন্য। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তবে কোন বিপদের জন্য তার জন্য করুণা করা যেতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের জন্য।'

নবম অন্তরায়: দ্রুত ফলাফল কামনা করা

কোনো কোনো ছাত্র অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ফলাফল পেতে চায়। এটাও ইলম হাসিলে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তারা মনে করে, ইলম খাদ্যের মতো, যা কয়েক গ্রাসে সাবাড় করা যায়! তাই সামান্য কয়েকটি মাস-বছর ব্যয় করেই আলেম, মুহাক্কিক, মুফাসসির হয়ে যেতে চায়। খলীফা মামুন এ ধরনের মানসিকতার কঠোর নিন্দা করে বলেন,

علم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث

'তিনদিন হাদীছের দরসে বসেই অনেকে বলে, আমি একজন মুহাদ্দিস!'

ইমাম শা'বী (রহ.)-কে বলা হলো, আপনি এই ইলম কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করেছেন? জবাবে তিনি বললেন-

لنفي الاعتماد، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب

'সামান্য ইলমে ভরসা না করা, বিভিন্ন দেশে সফর, পাথরের মতো অবিচলতা এবং কাকের মত প্রাতে বের হওয়া দ্বারা।'

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء

'কোনো ব্যক্তি এই মর্যাদা পর্যন্ত উন্নীত হতে পারবে না, যাবত না সে এর কারণে দারিদ্রের শিকার হয় এবং সবকিছুর ওপর ইলমকে প্রাধান্য দেয়।'

ইমাম ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান বলেন,

أقمت في الرحلة ثلاثين سنة

'আমি (ইলমের) সফরে ত্রিশ বছর কাটিয়েছি।'

ইবন হাদ্দাদ মালেকী (রহ.) বলেন,

ما للعلم وملائمة المضاجع

'নরম বিছানায় শুয়ে ইলম হাসিল করা যায় না।'

সুতরাং তালেবে ইলমের কর্তব্য হচ্ছে ইমামগণের এই মন্তব্য ও তাদের মুজাহাদ-মেহনতের কথা স্মরণ করে সে অনুযায়ী আমল করা এবং ইলম হাসিলের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করা।

জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ইলম হাসিল করেছেন কীভাবে? তিনি বললেন-

طلبته فوجدته بعيد المراد، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام .فتوسلت إليه بافتراش المدار، واستناد الحجر، وإدمان السهر وكثرة النظر، وإعمال الفكر ومتابعة السفر، وركوب الخطر: فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقي إلا بالدرس

আমি ইলম তলব করতে গিয়ে দেখলাম, এটি খুবই দূরবর্তী একটি বস্তু, যা তীর নিক্ষেপ করে নাগাল পাওয়া যায় না। স্বপ্নেও পাওয়া যায় না। বাপ-দাদা তথা পিতৃপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেও হাসিল হয় না। সুতরাং তা হাসিল করার জন্য আমি দোয়াতের

বিছানা বিছালাম, পাথরের গায়ে হেলাম দিলাম, দীর্ঘ নিশিজাগরণের অভ্যেস করলাম, গভীর দৃষ্টিপাত প্রদান করতে লাগলাম, ফিকির প্রলম্বিত করলাম, অব্যাহত সফর জারি রাখলাম, বিপদজনক বাহনে আরোহণ করতে লাগলাম। এসব করে দেখলাম, ইলম এমন এক বস্তু, যা রোপণ করা ছাড়া হাসিল হয় না। আবার রোপণ করতে হয়ে দিলের একেবারে গহীনে এবং রোপণ করার পর সিঞ্চন করতে হয় দরসের বারি।

দশম অন্তরায়: হীনমন্যতা

ইলম হাসিলের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে হীনমন্যতা। অনেকে ইলম শিখতে এসে হীনমন্যতায় ভোগে। কেউ ভাবে, ইলম শিখে কী হবে? অর্থাৎ পার্থিব জীবনের বড় ধরনের সফলতা না পাওয়ার আশঙ্কায় হীনমন্যতায় ভোগা। আবার কেউ কেউ হীনমন্যতায় ভোগার কারণে সামান্য ইলমে তুষ্ট হয়।

এটা ইলম হাসিলের জন্য যে কত বড় অন্তরায় তা পূর্বসূরীগণ ঠিকই বুঝেছিলেন। যেমন, এক কবি বলেন,

فكن رجلا رجله في الثرى ++ وهامة همته في الثريا

'সুতরাং তুমি হয় ওই ব্যক্তির মতো, যার পা ছুরাইয়া তারকার ওপর এবং হিম্মত ছুরাইয়া তারকা ছাড়িয়ে।'

একাদশ অন্তরায়: অবাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা

ইলমের পথে আরেকটি বড় অন্তরায় হচ্ছে কাজ না করে বড় বড় স্বপ্ন দেখা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ডুবে থাকা। যেমন, প্রয়োজনের সময় কাজ না করে সামনে কবর, পরে করা যাবে, ভবিষ্যতে করতে পারব- এ ধরনের ধারণা ও আশা রাখা। এগুলো হচ্ছে বোকা ও ব্যর্থ মানুষের ভাবনা। এভাবে আশা-আকাঙ্ক্ষা করা হবে বটে কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই শ্রেণীর মানুষের পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ۝٤٤ ﴾ [ابراهيم: ٤٤]

'আর তুমি মানুষদেরকে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আযাব নেমে আসবে। অতঃপর তখন যারা যুলম করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব'। ইতঃপূর্বে তোমরা কি কসম করনি যে, তোমাদের কোন পতন নেই?' {সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৪}

সুতরাং তালেবে ইলমের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে এ ধরনের ভাবনা থেকে দূরে থাকা এবং তৎপরতার সঙ্গে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া। সর্বদা এই আয়াত স্মরণে রাখা-

﴿ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَٰتِۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٤٨ ﴾ [البقرة: ١٤٨]

‘আর প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে চেহারা ফিরায়। সুতরাং তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৬}

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك

‘সন্ধ্যায় তুমি সকালের অপেক্ষা করো না এবং সকাল হলে সন্ধার অপেক্ষায় থেকো না। আর সুস্থতায় অসুস্থতার জন্য কিছু পুঁজি করো এবং জীবদ্দশায় মরণের জন্য সঞ্চয় করো।’

আশা-আশাক্ষার কাঙালদেরকে ভর্ৎসনা করে ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

عن مفسدات القلب: ركوبه بحر التمني ، وهو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم

‘অন্তরবিনাশী বিষয়গুলো মধ্যে অন্যতম হলো, অন্তরকে প্রত্যাশার সাগরে চড়ে দেওয়া। এটা এমন সাগর যার তীর নেই। আর এমন সাগর জগতের নিঃস্বরাই আরোহন করে।’

জনৈক হাকিমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-

من أسوء الناس حالا ؟ قال من بعدت همته واتسعت أمنيته ، وقصرت آلته وقلت مقدرته

'কোন ব্যক্তির অবস্থা সবচেয়ে বেশি শোচনীয়? জবাবে তিনি বললেন, যার হিম্মত কম, মাধ্যম নগণ্য এবং সক্ষমতাও সামান্য। অথচ আশা-আকাঙ্ক্ষা অগাধ।'

কেউ কেউ বলেন,

تجنبوا الأماني فإنها تذهب ببهجة ما خولتهم وتستصغرون بها نعمة الله عليكم فليتجنب هذا المرض وليحذر تمكنه منه فإنه كالسرطان الفتاك ، قل من يبرأ منه

'আশা ও প্রত্যাশা থেকে বিরত থাকো, কারণ তা তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তার সৌন্দর্য হরণ করে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের যত নেয়ামত দিয়েছেন তাকে স্বল্প জ্ঞান করবে। অতএব এ রোগ থেকে বেঁচে থাকো। এটি তোমাকে পেয়ে বসা থেকে সতর্ক থাকো। কেননা তা ধ্বংসাত্মক ক্যান্সারের মতো, কম মানুষই এ থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারে।'

হক্কানী উলামায়ে কেরামের পরিচিতি

এক. রব্বানী বা হক্কানী ওলামায়ে কেরামের প্রথম পরিচিতির ভিত্তি হচ্ছে ইলম। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّۦنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ٧٩ ﴾ [ال عمران: ٧٩]

'কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও'। বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৯}

আলোচ্য আয়াতে কিতাব পাঠ করার ইলম দ্বারা আলেমদের প্রধান শর্ত ইলমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে-

وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

(যেহেতু তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করতে।) এ আয়াত দ্বারা তাদের দরস প্রদান, ফিকহ-ফাতাওয়া নিয়ে গবেষণা করা, শায়খ-মুফতি হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

দুই. হক্কানী ওলামায়ে কেরামের দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে, ইত্তেবার গুণ অর্জন করা। অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহীন এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের পথে চলা। কুরআন-হাদীছে ইলমের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۝٧٩ ﴾ [ال عمران: ٧٩]

'কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও'। বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৯}

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল এবং পূর্ববতী নবীগণের ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার শিক্ষা গ্রহণ এবং তার অনুসরণ করা।

আল্লামা ইবন রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন,

العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبطُ نصوصِ الكتاب و السنة و فهمُ معانيها و التقيُّدُ في ذلكِ بالمأثور

'ইলমে নাফে হচ্ছে কিতাবের স্পষ্ট বর্ণনা আয়ত্ব করা, সুন্নাহ আয়ত্ব করা এবং এগুলোর অর্থ অনুধাবন এবং সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার আলোকে সেগুলো আয়ত্ব করা।'

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

العلم هو المعرفة الحاصلة بالدليل

‘ইলম হচ্ছে দলিলের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।’

তিন. হক্কানী আলেমের তৃতীয় গুণ হচ্ছে ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত। নিয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া কোনো ইবাদতই আল্লাহ তা‘আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একারণে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইখলাস ও নিয়তের পরিশুদ্ধি। উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »

‘নিশ্চয় আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্য তাই থাকবে যা সে নিয়ত করবে।’ [বুখারী: ১]

নিয়ত সহীহ থাকলে ইলমও যে নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে সেটা ইমাম মালেক (রহ.)-এর অভিমত দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি তার শাগরেদ ইবন ওয়াহাবকে বলেছিলেন-

على رسلك ! ترفَّق ! ليس الذي تقوم إليه - يعني من التنفل قبل الفريضة - بأفضل مما تقوم عنه إذا صحَّت النية

‘দাঁড়াও, কোমলতা অবলম্বন করো। তুমি যেখানে যাচ্ছ অর্থাৎ ইলম অর্জন ছেড়ে নফল সালাত আদায়ের দিকে, সেটা তার থেকে শ্রেষ্টতর নয় যাতে তুমি নিরত আছো, যদি তোমার নিয়ত ঠিক হয়।’

চার. চতুর্থ গুণ হচ্ছে ইলমের সঙ্গে মানানসই ব্যবহার ও আদব-কায়দা রক্ষা করা। আর এটা অর্জিত হয় ভাবগাম্ভীর্য, পরিশীলিত আচরণ ও স্বভাব দ্বারা। এবং এক্ষেত্রে আদর্শ হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও উস্তাদ হয়েও যে আদর্শ ও অন্যদের প্রতি পরিশীলিত আচরণ করেছেন, তা এক কথায় সকলের জন্য পালনীয় ও অনুসরণীয়।

পাঁচ. হক্কানী আলেমের পঞ্চম গুণ হচ্ছে আদর্শ শিক্ষা ও দীন বিস্তারের স্বার্থে মানুষের সঙ্গে মেশা ও সম্পর্ক রাখা। আপনি কীভাবে তাদেরকে দীন শিক্ষা দেবেন, অথচ আপনি অবস্থান করছেন দুর্ভেদ্য প্রাসাদে! কীভাবে মানুষকে তালিম দেবেন, আপনি যদি থাকেন আপনার নির্দিষ্ট মাদরাসা-মসজিদে আবদ্ধ? আপনি কীভাবে তাদেরকে কুরআন-হাদীছের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন, যদি আপনার ঘরের দরজার সামনে প্রতিবন্ধকতার তালা ঝুলানো থাকে? আপনি তাদেরকে কীভাবে ধর্মীয় জ্ঞান ও নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেবেন যদি আপনি তাদের থেকে থাকেন আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে?

তাই সাধারণ লোকদের মধ্যে কুরআন-হাদীছের শিক্ষা বিস্তার করতে হলে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদেরকে সময় দিতে হবে। হাদীছে এ কথারই সমর্থন রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ»

'আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুমিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশে এবং তাদের দেওয়া কষ্ট হজম করে সে ওই

মুমিন থেকে উত্তম, যে মানুষের সঙ্গে মেশে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টও সে হজম করে না।' [তিরমিযী: ২৫০৭; ইবন মাজাহ: ৪০৩২; সহীহ]

আজ আমাদের মধ্যে এই গুণের বড় অভাব। ওলামায়ে কেরামের অনেকেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে চান না এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও চলাফেরা করাকে দোষের কারণ বলে মনে করেন। একথা ঠিক যে, সাধারণ মানুষের দীনী অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ও শোচনীয় হওয়ার কারণে তাদের সঙ্গে ব্যাপক মেলামেশা ও সম্পর্ক রাখা নিজের দীনী গায়রতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিন্তু এটাও ভাবতে হবে যে, আলেমগণ যদি তাদেরকে এভাবে ছেড়ে রাখেন তবে শয়তান নামের বাঘ তাদেরকে মরুভূমিতে একাকি পেয়ে ছিঁড়েফেঁড়ে খেয়ে ফেলবে। টিভি, সিনেমা, গান-বাজনার সয়লাবে তাদের অবশিষ্ট ঈমানটুকুও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই ঈমান ও আমল বাঁচানোর স্বার্থে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা, সম্পর্ক রাখা এবং তাদের দীনী পরিবেশ চাঙ্গা রাখা অপরিহার্য। অন্তত আলোচ্য হাদীছের বাণী আমাদের জন্য সান্ত্বনা যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা দোষের নয় বরং দীনীস্বার্থে হলে তা প্রশংসনীয়।

ছয়. ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে ইলমের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করা। জাগতিক হীনস্বার্থে ইলমকে ব্যবহার করা থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন, হিকমত এবং ইলম দান করেছেন তিনি কেন দুনিয়ার লালসা করে এর অবমূল্যায়ন করবেন?

আলেমের শান হলো বাতিলের সঙ্গে আপস না করা। যেমন, ইয্য ইবন আবদুস সালাম (রহ.)-কে বলা হলো, আপনি সুলতানের মাথায় চুম্বন করুন, তিনি আপনাকে মার্জনা করবেন। তখন তিনি হাসলেন এবং বললেন-

مساكين ! أنت في وادٍ و أنا في واد ! أنا ما أرضى أن يقبلَ السلطانُ رأسي فكيف أقبِّل رأسَه ؟!

'মিসকিনের দল! তুমি এক উপত্যকায় আর আমি আরেক উপত্যকায়। আমি তো এটাই পছন্দ করি না যে, সুলতান আমার মাথা চুম্বন করুক, সেখানে আমি তার মাথা চুম্বন করব সেটা কী করে সম্ভব?'

আহ্! ইসলামের এই বীরসন্তানরা আজ কোথায়? এঁদের একেকজনের অস্তিত্ব গোটা মানবতার জন্য ছিল মুক্তির কারণ। কিন্তু এঁদের স্থান দখল করেছি আমরা নামধারী কতক অথর্ব মানুষ। যারা নিজেদের গায়রত হারিয়ে সামান্য অর্থকড়ির আশায় বিকিয়ে দিয়েছি নিজেদের স্বকীয়তা ও ধর্মীয় আভিজাত্য। পরিণামে লাঞ্ছিত হচ্ছি অহর্নিশ।

সাইয়েদ কুতুব (রহ.)-কে অন্যায়ভাবে শুধু ইসলামী আন্দোলন ও জিহাদ করার অপরাধে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর সময় বলা হলো, নিজের ওজর পেশ করে শুধু একটি বাক্য লিখে দিন। ফাঁসির দণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। জবাবে তিনি বললেন-

إن السبَّابة التي تشهد ألا إله إلا الله ، لا يمكن أن تكتب كلمةَ اعتذارٍ واحدةٍ تقرُّ بها حكمَ طاغية!

‘যে শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়া হয় সেই শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে এমন কোনো কথা লেখা সম্ভব নয়, যা বাতিল শাসকদের হুকুম বা আইনকে সমর্থন করে।’

সাত. সপ্তম গুণ হচ্ছে হেকমত। অর্থাৎ আলেমকে হেকমত ও প্রজ্ঞার গুণ অর্জন করা চাই। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ আয়াতের তাফসীর করেছেন হাকিম এবং ফকিহ হওয়ার দ্বারা। অর্থাৎ তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন- أي حكماء فقهاء রব্বানী হওয়ার অর্থ হলো তারা হবেন ফকীহ এবং হাকিম।’

আট. অষ্টম গুণ হচ্ছে নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দেয়া। অর্থাৎ বিনয়ী হওয়া এবং নিজের সত্তাকে ইলমের জন্য উৎসর্গ করে দেয়া। সুতরাং ইলমের জন্য নিজের সুবিধা ত্যাগ করা এবং কোনো কথা বা কাজে অন্যকে কষ্ট না দেয়া, হক বিষয় অনুধাবন করার পর তা মেনে নিতে সংকোচ না রাখা। মানুষের দোষের পেছনে না পড়া। ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) জনৈক ব্যক্তিকে ইলম অন্বেষণ করতে দেখে বললেন-

أنت رجلٌ فاضلٌ و السعيد من تموت سيآتُه بموته فلا تهجوَنَّ أحداً

‘আপনি সম্মানিত ব্যক্তি। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই, যার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার গুনাহরও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং আপনি কাউকে বদনামী করে হেয়প্রতিপন্ন করবেন না।’

ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব আসলে বিনয়ে, অহংকারে নয়। জনৈক শায়ের বলেন,

تَواضَعْ تَكُن كالنَّجمِ لاحَ لناظِرٍ   عَلَى طَبَقَاتِ الماءِ و هو رَفِيعُ

و لا تَكُ كالدُّخَانِ يعلُو مكانَه   على طَبَقَاتِ الجَوِّ و هو وَضِيعُ

‘বিনয়ী হও, দর্শকের দৃষ্টিতে নক্ষত্রের মর্যাদা লাভ করবে। নক্ষত্র পানির স্তরে যদিও নিচে মনে হয় কিন্তু আসলে তা সমুন্নত। কিন্তু অহংকারী হয়ো না। সেটা ধোঁয়ার মতো শূন্যে উচ্চ অনুমিত হলেও বাস্তবে তা মূল্যহীন, পতিত।’

সাত. সপ্তম গুণ হচ্ছে আমল। আলেমে রব্বানীর যাবতীয় গুণাবলীর ভিত্তি হচ্ছে আমল। আর আমলই হচ্ছে ইলমের ফলাফল। এ কারণেই সালফে সালেহীন আমল এবং ইলম উভয়ের সমষ্টিকে ফিকহ বলে নামকরণ করেছেন। আইউব সুখতিয়ানী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-

أيهما أكثرُ العلمُ اليومَ أم في الماضي ؟ فقال الكلامُ اليومَ أكثر ،لكنَّ العلمَ فيما تقدَّم أكثر

‘অতীতকাল এবং বর্তমানকাল, কোনকালে ইলম বেশি চর্চিত? তিনি বললেন, বর্তমান বেশি চর্চিত হচ্ছে ‘কথা’। আর অতীতকালে বেশি চর্চিত হতো ইলম।’

কথাটি কি আমাদের সময় আরো বেশিমাত্রায় প্রযোজ্য নয়? আমাদের সময়ে কথাই হচ্ছে বেশি। কিন্তু কলব পর্যন্ত পৌঁছে যে ইলম এবং ইলমের ফলাফল যা, তথা আমল ও সততা, তা আজ ক্রমেই বিরল হয়ে পড়ছে।

মারূফ কারখী (রহ.) বুযুর্গ, মুত্তাকী, দুনিয়াবিমুখ ও বিশ্বখ্যাত একজন আবেদ ছিলেন। তাঁর তাকওয়া-পরহেজগারী এবং ইবাদত-বন্দেগি ছিল প্রবাদতুল্য। অনেক কিতাবে তার বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। একবার আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মজলিসে উপস্থিতদের একজন বললেন-

معروف قصيرُ العلم

'মারূফ (কারখীর {রহ.}) তো ইলম কম!'

লোকটির কথায় ইমাম আহমাদ (রহ.) নাখোশ হলেন এবং বললেন-

أَمْسِكْ عافاكَ الله ، و هل يُرادُ من العلمِ إلاَّ ما وَصَل إليه معروف ؟!

'থামো! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মাফ করুন। আরে ইলম দ্বারা তো সেটাই উদ্দেশ্য, যেখানে মারূফ কারখী (রহ.) পৌঁছেছেন।'

অর্থাৎ আমরা তো ইলম দ্বারা এর পরিণাম বা ফলাফল বুঝি তথা আমল। আর এই বিষয়টি মারূফ কারখীর (রহ.) মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি ইলমে দুর্বল একথা বলার সুযোগ নেই।

আরেকবারের ঘটনা। একবার আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন-

يا أبَتِ هل كان معروف معه شيءٌ من العلم ؟

‘সম্মানীত পিতা! মারূফ কারখী (রহ.) কি ইলমের কারণে প্রসিদ্ধ?!

জবাবে আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) বললেন-

يا بني ! معه رأسُ العلمِ خشيةُ الله تعالى

‘বৎস! তাঁর মধ্যে তো ইলমের সর্বোচ্চ চূড়াই বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার ভয়।’

বস্তুত পুণ্যবান পূর্বসূরীদের এসব কথা হাদীছে নববীরই প্রতিধ্বনি। ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى، وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»

‘আবূ মূসা আশআ’রী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান

বিজ্ঞান ও হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হচ্ছে এমন মুষলধারার বৃষ্টির মতো যা ভূমিতে এসে পড়েছে, ফলে এর কিছু অংশ এমন উর্বর পরিষ্কার ভূমিতে পড়েছে যে ভূমি পানি চুষে নিতে সক্ষম, ফলে তা পানি গ্রহণ করেছে, এবং তা দ্বারা ফসল ও তৃণলতার উৎপত্তি হয়েছে। আবার তার কিছু অংশ পড়েছে গর্তওয়ালা ভূমিতে (যা পানি আটকে রাখতে সক্ষম) সুতরাং তা পানি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, ফলে আল্লাহ এর দ্বারা মানুষের উপকার করেছেন তারা তা পান করেছে, ভূমি সিক্ত করিয়েছে এবং ফসলাদি উৎপন্ন করতে পেরেছে। আবার তার কিছু অংশ পড়েছে এমন অনুর্বর সমতল ভূমিতে যাতে পানি আটকে থাকে না, ফলে তাতে পানি আটকা পড়েনি, ফসলও হয়নি। ঠিক এটাই হলো ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনকে বুঝতে পেরেছে এবং আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হতে পেরেছে, ফলে সে নিজে জেনেছে এবং অপরকে জানিয়েছে। (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি)। এবং ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে এই হিদায়েত এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে মাথা উঁচু করে তাকায়নি, ফলে আল্লাহ যে হিদায়েত নিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা গ্রহণ করেনি। (তৃতীয় শ্রেণর ভূমি) ।' [সহীহ বুখারী: ৭৯, সহীহ মুসলিম: ২২৮২]

সুতরাং আমলকারী ও ইলম বিস্তারকারী আলেম ওই কার্যকর মাটির মতো, যাতে বৃষ্টির পানি পতিত হয় এবং তাতে মাটি সিক্ত, কোমল ও তরুতাজা হয় এবং সবুজ-শ্যামল ফলমূল ও ফসল উৎপন্ন করে।

অতএব ইলমের ফলাফল হচ্ছে আমল, ইবাদাত, দাওয়াত এবং সবর।

হাদীছের ভাষ্যানুযায়ী দ্বিতীয় প্রকার মাটির সঙ্গে তুলনীয় হচ্ছেন ওইসব ব্যক্তি, যাদের কাছে কুরআন-হাদীছের বর্ণনা আছে বটে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল নেই। ফলে তারা ওই মাটির মতো যে মাটি পানি ধরে রাখে কিন্তু নিজে এর দ্বারা উপকৃত হয় না। বরং অন্যরা উপকৃত হয়। ঠিক তদ্রূপ এসব লোক ইলম দ্বারা নিজেরা উপকৃত হয় না বরং তাদের দ্বারা অন্য লোকেরা উপকৃত হয়।

আর তৃতীয় প্রকার মাটির সঙ্গে তুলনীয় হচ্ছে ওইসব লোক, যাদের নিজেদের মধ্যে ইলম নেই। ফলে নিজেরাও এর দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অন্যরাও উপকৃত হতে পারে না। ফলে তারা ওই সব পাথুরে মাটির মতো, যা পানি ধরে না রাখার কারণে নিজেও উপকৃত হতে পারে না এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করতে পারে না।

ইলমহীন তালেবে ইলমের অবস্থা বর্ণনা করে কবি বলেন,

زَوَامِلَ للأسفارِ لا عِلْمَ عندَهُم □□ بجيّدِهَا إلا كعِلْمِ الأباعِرِ

لَعَمْرُكَ ما يدري البعيرُ إذا غَدَا □□ بأسفارِهِ أو رَاحَ ما في الغَرَائِرِ!

‘কিছু কিতাবাদীর সঙ্গী, যাদের কাছে উত্তম কোনো ইলম নেই, তবে উটের বিষ্টার মতো।

তোমার জীবনের শপথ! কিতাবের বোঝা নিয়ে উট চলাচলের সময় সে জানে না তার থলে বা পিঠে কী আছে।’

আল্লাহ আমলহীন ইলমধারীকে বোঝাবহনকারী গর্দভের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوۡرَىٰةَ ثُمَّ لَمۡ يَحۡمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلۡحِمَارِ يَحۡمِلُ أَسۡفَارَۢاۚ بِئۡسَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٥ ﴾ [الجمعة: ٥]

'যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল তারপর তারা তা বহন করেনি, তারা গাধার মত! যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে। সে সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা নিকৃষ্ট, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' {সূরা আল-জুমুআ', আয়াত: ৫}

যাহোক, ইলম হচ্ছে পথনির্দেশক আর আমল হচ্ছে ফলাফল। এবং উভয়ের সমষ্টিই হচ্ছে ফিকহ। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে-

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ »

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তিনি তাকে দীনী বিষয়ে প্রাজ্ঞতা দান করেন।' [বুখারী: ৩১১৬; মুসলিম: ১০৩৭]

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

وأنت في صلاتك تقول: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ، و ما الصراط المستقيم إلا العلم و العمل بالهدى و دين الحق.

‘তুমি সালাতে বলো হে আল্লাহ! আমাকে সোজা পথ দেখান। সোজা পথ তো ইলম এবং হেদায়াত ও দীনে হকের ওপর আমল করা ছাড়া আর কিছু নয়।’

দশ. আলেমের দশম গুণ হচ্ছে তালিম বা শিক্ষাপ্রদান। বস্তুত নবী-রাসূলগণের প্রধান কর্তব্যই ছিল তালিমে দীন। আর দীনী ইলম শিক্ষাপ্রদানকারীর প্রতি আল্লাহ তা‘আলার সীমাহীন করুণা রয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা খাস রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য কল্যাণের দু‘আ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনী শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব প্রদান করে ইরশাদ করেন-

بلغوا عني وَلَو آيةً

‘তুমি একটি আয়াত জানলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।’ [সহীহুল জামে: ২৮৩৭]

দীনের প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যাপৃত লোকদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জীবন সুখী-সমৃদ্ধ হওয়ার ঘোষণা এসেছে হাদীছে। ইরশাদ হয়েছে-

«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ »

‘আল্লাহ তা‘আলা ওই ব্যক্তির জীবন সুখী-সমৃদ্ধ করুন, যে আমার হাদীছ শ্রবণ করে অতপর তা মুখস্থ করে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়।’ [সহীহ ইবন হিব্বান: ৬৯, হাসান]

হক্কানী তালেবে ইলমের পরিচয়

তালেবে ইলমের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণগুলো থাকা চাই। যথা-

এক. আত্মিক পরিশুদ্ধি। অর্থাৎ যাবতীয় নিকৃষ্ট স্বভাব ও চারিত্রিক নিম্নমুখিতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। কেননা ইলম হচ্ছে কলবের ইবাদত। সালাত যেমন বাহ্যিক পবিত্রতা ছাড়া আদায় হয় না, তেমনি অন্তরের ইবাদত ও পরিচর্যা আত্মিক পবিত্রতা ছাড়া অর্জিত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। পড়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই কোনো কাগজে শুধু দৃষ্টি পড়লেই তা মুখস্থ হয়ে যেত। একদিন তিনি একটি বিষয় হিফজ করতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, তার স্মৃতিশক্তি আজ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাকে সঙ্গ দিচ্ছে না। তিনি বিচলিত হলেন এবং এর কারণ উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কারণ উদ্ঘাটন করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দ্বারস্থ হলেন উস্তাদ ওয়াকী‘ ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর। উস্তাদ বললেন, নিঃসন্দেহে কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়েছে। তিনি আরো বললেন, ‘ইলম হচ্ছে একটি মস্ত বড় নূর। আর আল্লাহ তা‘আলা এই নূর তাঁর নেক বান্দা ছাড়া অন্য কাউকে দান করেন না। আর কোনো নেক বান্দাও যখন গুনাহ করে তখন তার থেকে এই নূর উঠিয়ে নেওয়া হয়।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) শের ও কবিতাশাস্ত্রেও অত্যন্ত দক্ষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। উস্তাদের কথাগুলোকে তিনি কাব্যের ফ্রেমে বেঁধে ফেললেন এভাবে-

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ##فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور ##ونور الله لا يعطى لعــــــاصي

'আমি উস্তাদ ওয়াকী (রহ.)-এর কাছে স্মরণশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপ ছেড়ে দেয়ার আদেশ করলেন এবং বললেন, ইলম হচ্ছে নূর। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূর কোনো পাপীকে দান করেন না।'

দ্বিতীয়: গুণ হচ্ছে, ইলমকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা।

তৃতীয়: ইলম অন্বেষণ করতে গিয়ে দাম্ভিকতা ও অহংকার পরিহার করা এবং উস্তাযের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য না করা। ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যথা-

'যায়দ ইবন ছাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার জানাযার সালাত আদায় করলেন। (সালাত শেষে) সওয়ার হওয়ার জন্য খচ্চর পেশ করা হলো। এটা দেখে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এগিয়ে এলেন এবং রেকাবি ধরলেন। যায়দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে রাসূলের চাচার পুত্র! আপনি রেকাবি ছেড়ে দিন। ইবন আব্বাস

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমরা আলেম ও উস্তাদদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতেই আদিষ্ট হয়েছি।’

চার. উস্তাদের সঙ্গে পূর্ণ আদব বজায় রেখে চলা। সুতরাং উস্তাদকে দুর্বোধ্য কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত না করা। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, ‘আলেমের হক হচ্ছে, তাকে বেশি বেশি জিজ্ঞেস না করা। তাকে কষ্টে নিপতিত না করা। ক্লান্তিবোধ করলে প্রশ্নবাণে জর্জরিত না করা। আর তোমার আবশ্যক দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার ওয়াস্তে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।’

পাঁচ. উপকারী কোনো ইলম ও শাস্ত্র পরিহার না করা। বরং সুযোগ-সুবিধা মতো উপকারী সব শাস্ত্রই আয়ত্ত করা।

ছয়. তলবে ইলমের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি। সুতরাং এর দ্বারা ধন-সম্পদ, মাল-দৌলত, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের নিয়ত না করা। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলম শিখবে আল্লাহ তা‘আলা তার মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

সাত. তলবে ইলমের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে অন্যকে সংশোধনের আগে নিজে সংশোধন হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইরশাদ করেন-

﴿ ۞أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٤٤ ﴾ [البقرة: ٤٤]

‘তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না?’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 88}

জনৈক কবি ও সাধক বলেন,

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التـــــــــــعليم

تصف الدواء لذي السقامة والضنى كيما يصح به وأنت سقيم

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيـــــــم

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيـــم

‘হে অন্যকে শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি! কেন তুমি অন্যকে বিস্তার করা শিক্ষা তোমার নিজের ভেতর কার্যকর করছ না?

নিরাময়কারী ওষুধ বাতলে দিচ্ছ তুমি, অথচ তুমি নিজেই রোগাক্রান্ত!

মানুষকে সেই কাজে বাধা দিও না, তুমি নিজে যে কাজ করো। কেননা, এটা মানুষের দৃষ্টিতে খুবই নিন্দনীয়।

প্রথমে নিজের নফসকে দিয়ে শুরু করো এবং নফসকে ভ্রষ্টতা থেকে হেফাজত করো। যদি তুমি তা করতে পারো তবে তুমিই হাকিম, তুমিই বিজ্ঞ ব্যক্তি।’

২য় পরিচ্ছেদ:

ইলম অন্বেষণের বিভিন্ন ঘটনা

রাখালের ইলম: পৃথিবীর যাবতীয় ইলম ছয়টি বস্তুর মধ্যে!

মাঠে এক রাখালের সঙ্গে ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি রাখালকে বললেন, হে যুবক! তুমি গোটা জীবন এই পশুচারণের মধ্যে কাটিয়ে দিলে! যদি জীবনকে ইলম অন্বেষণের কাজে ব্যয় করতে হবে কতই না উত্তম হতো! জবাবে রাখাল বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি ইলম ভাণ্ডার থেকে ছয়টি বস্তু গ্রহণ করেছি এবং সে অনুযায়ী আমল করি। যথা-

এক. ما دام الحلال موجوداً لا آكل حراماً ‘যতক্ষণ হালাল বস্তুর অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম ভক্ষণ করি না।’

দুই. ما دام الصدق موجوداً لا أكذب ‘যতক্ষণ সত্য বলার সুযোগ আছে ততক্ষণ মিথ্যার আশ্রয় নিই না।’

তিন. ما دمت أرى عيبي لا أنشغل بعيوب الآخرين ‘যতক্ষণ আমার নিজের মধ্যে দোষ আছে ততক্ষণ অন্যের দোষ তালাশ করি না।’

চার. حيث لم أجد إبليس قد مات لا أئتمن وساوسه ‘যতক্ষণ ইবলিশকে মৃত না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত তার চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবব না।’

পাঁচ. ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর খাজানা খালি না হতে দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত মাখলুকের খাজানার প্রতি লালায়িত হবো না। আর এখন পর্যন্ত আল্লাহর খাজানা শূন্য হয়নি। অতএব আমাকে মাখলুকের প্রতিও ধাবিত হতে হয় না।’

ছয়. حيث لم أر رجلي تطئان الجنة لا أؤمن عذاب الله تعالى ‘যতক্ষণ দুই পা জান্নাতে বিচরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার আজাবের ব্যাপারে উদাসীন হবো না।’

ঈসা (আ.) এই ব্যক্তির কথা শুনে বললেন-

هذا هو علم الأولين والآخرين الذي قرأته أنت وأخذته

‘এটা হলো পূর্ববতী-পরবর্তী সকলের ইলম, যা তুমি পাঠ করেছ এবং নিজের মধ্যে সঞ্চিত করেছ।’

ইলম অন্বেষণে অবিচলতা

‘মিরাজুস সাআদা’ গ্রন্থের সংকলক মির্জা মাহদী নিরাকী (রহ.) খুব অর্থকষ্টে জীবন যাপন করতেন। এত অর্থকষ্ট ছিল যে, অধ্যয়নের উপকরণাদিই সংগ্রহ করতে পারতেন না। বিভিন্ন সময় মাদরাসার চেরাগের আলোতে মুতালাআ করতেন। কিন্তু কাউকে অর্থকষ্টের কথা বুঝতে দিতেন না। এত অর্থকষ্ট ও দারিদ্রের মাঝেও ইলমের সঙ্গে লেগে থাকতেন। এমনকি বাড়ি থেকে যে চিঠিপত্র আসত তাও কখনও খুলতেন না এই আশঙ্কায় যে, এতে হয়ত এমন কোনো সংবাদ থাকবে যা অধ্যয়ন ভাবনাকে এলোমেলো এবং দরস থেকে

বঞ্চিত করবে। ফলে চিঠিগুলো না খুলেই বিছানার নিচে রেখে দিতেন।

এক চিঠিতে পিতা আবূ যর (রহ.)-এর শাহাদাতের সংবাদ এল। কিন্তু চিঠিটি অভ্যাস মোতাবেক আগের মতোই বিছানার নিচে রেখে দিলেন। ফলে বাড়ির লোকজন নিরাশ হয়ে তার উস্তাদের কাছে চিঠি লিখলেন এবং পুরো পরিস্থিতি অবহিত করে তাকে তা জানানোর অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিরাকে (বাড়িতে) পাঠিয়ে দেয়ারও অনুরোধ করলেন, যাতে তিনি বাড়ি এসে পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ-বণ্টন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করেন।

পরের দিন নিরাকী (রহ.) দরসে হাজির হলে উস্তাদ তার হাত ধরলেন। সে সময় তিনি ভীষণ চিন্তিত ও গম্ভীর ছিলেন। উস্তাদের এই অস্বাভাবিক অবয়ব দেখে নিরাকী (রহ.) বললেন, হযরত! আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

জবাবে উস্তাদ বললেন, তোমাকে নিরাক যাওয়া দরকার। তিনি বললেন, কেন? উস্তাদ বললেন, তোমার বাবা অসুস্থ ছিলেন। সেজন্য যাওয়া দরকার। নিরাকী (রহ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ করবেন এবং হেফাজত করবেন। অতএব আপনি দরস শুরু করুন!

শাগরেদ ইশারা বুঝতে পারছে না দেখে উস্তাদ আসল ঘটনা খুলে বললেন এবং তৎক্ষণাত তাকে নিরাক যেতে বললেন। উস্তাদের আদেশে তিনি বাড়ি গেলেন বটে কিন্তু মাত্র তিনদিনের মধ্যে যাবতীয়

দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আবার দরসে হাজির হলেন। সুবহানাল্লাহ, আমরা এই পূর্বসূরীদের অনুসারীর দাবিদার!

যে বাসনা মৃত্যুযন্ত্রণাকেও হার মানায়!

কারো কারো বাসনা ও চাওয়ার বস্তু থাকে একেবারেই ভিন্ন। তাদের সেই বাসনা কোনো কিছুতেই দমে না। মৃত্যুর মতো অকাট্য ফয়সালাও যেন ওই বাসনার কাছে হার মানে। এ ধরনেরই এক বাসনা হলো ইলম অন্বেষণের বাসনা। ইতিহাসে এমন সব ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন যাদের এই বাসনার কাছে মৃত্যু যন্ত্রণাও হার মানত।

জনৈক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, আমি বুঝতে পারছি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আমার মৃত্যু হবে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন-

الموت ليس مشكلة كلنا نموت

'মৃত্যু তো মুশকিল কিছু নয়। আমরা সবাই মৃত্যু বরণ করব।'

লোকটি বললেন, এই সময় আমার করণীয় কী? আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, اطلب العلم 'ইলম অন্বেষণ কর। কেননা কোনো মাসআলা জানতে জানতে মৃত্যু বরণ করা ওই মাসআলা সম্পর্কে জাহেল থেকে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে উত্তম।'

আবূ রায়হান বিরুনী (রহ.) জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন-ফালসাফা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বি ব্যক্তি

ছিলেন। চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি সর্বজন স্বীকৃত বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সর্বদা ইলম হাসিলের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কোনো সময় দৃষ্টি পাঠ থেকে, অন্তর ভাবনা থেকে, হাত লেখালেখি থেকে, যবান বর্ণনা থেকে মুক্ত থাকত না। কেবল নতুন ফসল উঠানোর সময় ছাড়া।

তিনি যখন 'আল-কানুনুল মাসউদী' গ্রন্থটি সংকলন করেন তখন সুলতান খুশি হয়ে তাকে রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণের অনুমতি দেন। কিন্তু সম্পদের প্রতি বিন্দুমাত্র লালসা না থাকায় তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

একবার তার কাছে জনৈক ভক্ত আসলেন। তখন তিনি নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করছিলেন। সেই মুহূর্তে তিনি আগন্তুককে বললেন, মীরাছের সম্পদে দাদীদের অংশের ব্যাপারে তুমি যেন আমাকে কী প্রশ্ন করেছিলে? আগন্তুক বললেন, এই সময়ে মাসআলার আলোচনা? আল-বিরুনী (রহ.) বললেন, অবগত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া কি অজ্ঞ অবস্থায় বিদায় নেয়ার চেয়ে উত্তম নয়?

আগন্তুক বলেন, তখন আমি মাসআলাটি উল্লেখ করলাম এবং একটু পরে বের হয়ে এলাম। বের হয়ে রাস্তায় নামতেই কান্নার রোল শুনতে পেলাম।

সাক্কাকী (রহ.)-এর ইলমীযাত্রা

ইমাম সাক্কাকী (রহ.) ইসলামী ইতিহাসের একজন বিরল ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। পুরো নাম ইউসুফ ইবন আবূ বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-খারেযমী এবং উপাধি সিরাজুদ্দিন সাক্কাকী (রহ.)। তিনিই বিখ্যাত ‘মিফতাহুল উলুম’ গ্রন্থের মুসান্নিফ। গ্রন্থটিতে তিনি বারোটি আরবী ইলম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অথচ তিনি নিজে আরবী ছিলেন না!

জীবনের প্রথমযাত্রায় সাধারণ একজন কামার ছিলেন। সুন্দর ও আকর্ষণীয় তৈজসপত্র ও শিল্পসামগ্রী বানাতে পারতেন। একদিন তিনি সুন্দর আকৃতির একটি লোহার সিন্দুক বানালেন। এতে বিস্ময়কর একটি তালা লাগালেন। অথচ সিন্দুকের ওজন ছিল মাত্র এক রিতল এবং তালার ওজন ছিল এক কিরাত!

এরপর তিনি সিন্দুকটা ওই যুগের বাদশাকে উপঢৌকন হিসেবে দিলেন। বাদশা ও রাজন্যবর্গ সিন্দুকটি দেখে বিস্মিত হয়ে প্রস্তুতকারীকে উপহার দিলেন এবং তার উপস্থিতিতে তার পরম প্রশংসা করতে লাগলেন। পুরো মজলিসজুড়ে যখন তার কীর্তির প্রশংসা চলছিল ঠিক সে সময় একজন আগন্তুকের আগমন ঘটল। বাদশা আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজ আসনে তাকে বসতে দিলেন। সাক্কাকী ঘটনাটি দেখে অবাক বলেন এবং জানতে পারলেন, আগন্তুক একজন বিশিষ্ট আলেম। এটা জেনে সাক্কাকী (রহ.) ভাবলেন, তিনিও যদি আলেম হন তবে সিন্দুক বানিয়ে যে বাহবা কুড়িয়েছেন এরচেয়ে ঢের বেশি সম্মান, মর্যাদা ও মূল্য পাবেন। ফলে সিদ্ধান্ত নিয়ে তখনই মাদরাসার দিকে রওয়ানা হলেন।

যখন এই কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি, তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর! তাই মাদরাসার শিক্ষক বললেন, তোমার যে বয়স তাতে সম্ভবত তুমি ইলম হাসিল করতে পারবে না! আর তোমার মেধা ও মনমানসিকতার যে অবস্থা, আমি অনুমান করতে পারছি তাতে তুমি ঠিকভাবে ইলম হাসিল করতে সক্ষম হবে না এবং এই বয়সের ইলম তোমার কাজেও আসবে না। অতএব আগে একটা পরীক্ষা নেওয়া যাক। একথা বলে ওই মুদাররিস তার মাযহাব অনুযায়ী তাকে একটি দরস দিলেন এবং বললেন-

قال الشيخ: جلد الكلب يطهر بالدباغة،

'শায়খ বলেছেন, কুকুরের চামড়া প্রক্রিয়াকরণ (দাবাগাত) করলে তা পবিত্র হয়।'

উস্তাদ কথাটা তাকে বারবার আওড়াতে বললেন। পরেরদিন সাক্কাকী (রহ.) দরসে হাযির হলে উস্তাদ গতকালের সবক শুনতে চাইলে সাক্কাকী (রহ.) সবক শোনাতে গিয়ে বললেন-

قال الكلب: جلد الشيخ يطهر بالدباغة

'কুকুর বলেছে, শায়খের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা তা পবিত্র হয়!'

তার কথায় মজলিসে হাস্যরোলের সৃষ্টি হলো। যাহোক, এরপর উস্তাদ তাকে আরেকটি সবক দিলেন। এভাবে পারা না পারার মধ্য দিয়ে তার অক্লান্ত জ্ঞানসাধনা চলতে থাকল এবং দীর্ঘ দশ বছর এই সাধনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। কিন্তু তবু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না

পেয়ে এবং উস্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে দেখে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়লেন সাক্কাকী (রহ.)। গোটাজগত যেন তার কাছে সংকুচিত হয়ে আসে। সেই হতাশার মধ্যে একদিন তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন, একটা শক্ত পাথরে ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানিয়ে গড়িয়ে পড়ছে এবং পানি পড়ার স্থানে জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে গেছে। এই দৃশ্য তাকে দারুণভাবে নাড়া দিল। তিনি ভাবলেন এবং মনে মনে বললেন-

ليس قلبك بأقسى من هذه الحجرة ولا خاطرك أصلب منها حتى لا يتأثر بالتحصيل

'তোমার অন্তর এই পাথরের চেয়ে শক্ত নয় এবং চিন্তাশক্তি এরচেয়ে দুর্ভেদ্য নয় যে, তুমি তালিম দ্বারা প্রভাবিত হবে না।'

একথা বলে তিনি আবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাদরাসায় ছুটে গেলেন। মজবুতভাবে ইলম হাসিলে লেগে রইলেন। আল্লাহ তা'আলা এই মুজাহাদা ও ত্যাগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। ফলে ত্যাগের নজরানা পেশ করতে পারায় তিনি তার জন্য ইলম ও মারেফাতের দ্বার খুলে দিলেন। যার ফলে তিনি নিজ যমানার অনেক মনীষীকে ইলম-কামালে ছাড়িয়ে গেলেন। তাই সাক্কাকী (রহ.) আজ ইতিহাসের বিরাট অংশের হকদার। কত কিতাব তিনি সংকলন করলেন, কতভাবে জাতি আজ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে! কিন্তু তিনি যদি সেদিন দমে যেতেন, পাথর আর পানির দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত না

হতেন তবে কি ইতিহাসের কোনো পাতায় সাক্কাকী নামের কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত?

বস্তুত ইলম হাসিল করতে এভাবেই অনুপ্রাণিত হতে হয়, হতাশ ও নিরাশ না হয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় কদমে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। তবেই পৌঁছা যায় পরম গন্তব্যে, দখল করা যায় ইতিহাসের তাজাপাতা।

ইলম ও মুআল্লিমের প্রতি ইমাম রাযীর (রহ.) সম্মান প্রদর্শনের বিস্ময়কর ঘটনা

ইয়াকুত আল-হামাবী (রহ.) 'মু'জামুল উদাবা' গ্রন্থে আবূ তালেব আজিজুদ্দীন (হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের একজন আরবী আদীব)-এর বরাতে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) মারভ এলাকায় আগমন করলেন। এখানে তার সীমাহীন কদর, মর্যাদা, সম্মান ও মূল্যায়ন ছিল। কেউ তার কথা কাটতে সক্ষম হতেন না। উপকৃত হতে আমিও তার মজলিসে উপস্থিত হলাম।

একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমি চাই তুমি আমার জন্য 'সিলসিলাতুত ত্বলিবীন' (আবূ তালেবের আওলাদদের নাম) সংকলন করবে, যা আমি পাঠ করব। আমি এই ব্যাপারে জাহেল থাকতে চাই না।

আমি বললাম, নসবনামা ‘শাজারা’ (বংশের ধারাবাহিকতা) অনুসারে লিখব নাকি ছন্দাকারে? তিনি বললেন, আমি চাই এভাবে লিখবে, যাতে তা স্থায়ীভাবে আত্মস্থ করা সম্ভব হয়। আর শাজারা আকারে লেখা হলে এই উদ্দেশ্য হাসিলে বিঘ্ন ঘটে।

আমি বললাম, আপনার আদেশ শিরোধার্য। একথা বলে আমি ঘরে চলে গেলাম এবং কিতাবটি লিখে নামকরণ করলাম ‘আলফাখরী’ এবং তা ইমাম রাযী (রহ.)-এর সামনে হাজির করলাম।

আমার হাতে সংকলিত কিতাব দেখে তিনি স্বীয় মসনদ থেকে নেমে পড়লেন এবং চাটাইয়ের ওপর বসে পড়লেন। আর আমাকে বললেন, আপনি এই মসনদের ওপর বসুন!

আমি চিন্তা করলাম, তার উপস্থিতিতে তারই মসনদে উপবেশন করা ধৃষ্টতা প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অলঙ্ঘনীয়ভাবে আমাকে সেখানে বসার আদেশ দিয়ে বললেন- اجلس في المكان الذي أقوله لك

‘আমি যেখানে বসতে বলছি সেখানে বসুন।’

ফলে ভক্তি-ভীতি এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মসনদে বসলাম। তিনি আমার সামনে মুখোমুখি বসলেন এবং কিতাব পাঠ শুরু করলেন। এসময় তিনি আমাকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। এভাবে একপর্যায়ে পূর্ণ কিতাব পড়া শেষ করলেন। অতপর বললেন-

الآن اجلس أي مكان تريده لأن في هذا الكتاب علماً وأنت في هذا العلم أستاذي وأنا تلميذك

'এখন থেকে আপনি যেখানে চান বসতে পারেন। কেননা এই কিতাবে ইলম আছে এবং এই ইলমের ব্যাপারে আপনি আমার উস্তাদ এবং আমি আপনার ছাত্র। আমি এখন থেকে আপনার উপস্থিতিতে ছাত্রের বেশ ধারণ করব, যাতে আপনার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি!'

এরপর আমি অনুরোধ করলাম যাতে তিনি তার মসনদে বসেন এবং আমি আমার স্থানে বসি। আমি যাতে স্বাচ্ছন্দে আগের মতো ইলম হাসিল করতে পারি।

আরেকটি ঘটনা:

কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) আহকামুল কুরআন (১/১৮২-১৮৩) গ্রন্থে এ ধরনের আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবন কাসেম উসমানী (রহ.) আমাকে অনেকবার ঘটনাটি বলেছেন। তিনি বলেন, আমি একবার ফুস্তাত এলাকায় গমন করলাম এবং শায়খ আবুল ফজল জাওহারী (রহ.)-এর দরসের মজলিসে বসলাম। দরসে আরো বহু লোকের সমাগম ছিল। আমি প্রথমবার যে মজলিসে শরীক ছিলাম সেই মজলিসে তিনি দরস প্রদান করতে গিয়ে একটি হাদীছ উল্লেখ করলেন। যথা-

إن النبي صلى الله عليه وسلم طلَّق، وظاهر، وآلى الخ

‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাক প্রদান করেছেন এবং জিহার ও ইলাও করেছেন।’

তিনি সেদিন দরস শেষ করে বের হলে আমিও পিছে পিছে তার ঘর পর্যন্ত গেলাম। ঘরেও একদল লোকের ভিড় ছিল। তিনি আমাদেরকে দেহলিজে বসালেন এবং সকলের কথা শুনে ও প্রয়োজন মিটিয়ে আমার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমার কিছু কথা আছে। তিনি বুঝতে পারলেন, আমি একাকিত্বে কথাটা বলতে চাচ্ছি। তাই তিনি মজলিস খালি করার আদেশ করলেন। মজলিস খালি হলে আমি বললাম, আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার মজলিসে বসেছিলাম। দরসে আপনার বর্ণনা শুনলাম, আপনি বর্ণনা করছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ইলা’ করেছেন ঠিক আছে। তালাক প্রদান করেছেন সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু জিহারের ব্যাপারে যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেন নি এবং তাঁর দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া সম্ভবও নয়। কেননা জিহার হচ্ছে, অবাস্তব কথার নাম। আর তা কোনো নবীর দ্বারা প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব।

আমার কথা শুনে তিনি আমাকে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন, মাথায় চুম্বন করলন এবং বললেন-

أنا تائب من ذلك ، جزاك الله عني من معلِّمٍ خيراً

‘আমি আমার ওই বক্তব্যের কারণে তওবা করছি। আল্লাহ তা‘আলা আমার পক্ষ থেকে মুআল্লিমকে নেক প্রতিদান প্রদান করুন।’

এরপর আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম এবং পরের দিন খুব সকালে তার মজলিসে শরীক হলাম। দেখলাম তিনি আমার আগেই পৌঁছেছেন এবং মিম্বারে আরোহণ করেছেন। জামে মসজিদের প্রধান দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই তিনি আমাকে দেখে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, ‘আমার উস্তাদকে স্বাগতম’, ‘আমার উস্তাদের আসার পথ করে দাও’। তার এই ডাক শুনে অসংখ্য লোক আমার দিকে দৃষ্টি দিতে লাগলেন। সকলে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং তারা আমাকে মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যেতে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করলেন।

লজ্জায় আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। সংকোচে এতটাই উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলাম, বুঝতেই পারছিলাম না, আমি কোথায় আছি।

এরপর শায়খ উপস্থিত লোকদের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন, ‘আমি তোমাদের উস্তাদ। আর আমার উস্তাদ এ! কেননা গতকাল আমি তোমাদেরকে যা বলেছিলাম তোমরা তার সব মেনে নিয়েছিলে এবং কোনো বিষয়ে দ্বিমত করনি। কিন্তু ইনি আমার বাড়িতে গেছেন এবং একটি ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। তাই আমি গতকালের সেই ভুলের জন্য তওবা করেছি এবং তার কল্যাণে হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। সুতরাং গতকালের যারা এখানে

উপস্থিত আছো তারা ভুল শুধরে নাও এবং যারা অনুপস্থিত আছে তাদেরকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও।’

এরপর তিনি মাহফিলের সকল লোককে নিয়ে আমার জন্য দু‘আ করলেন। লোকেরা সমস্বরে আমীন আমীন বললেন।

বস্তুত প্রকৃত ইলমের মজা ও স্বাদ যারা পান তারা এভাবেই বিনয় ও সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হন। অন্যথায় সারাদেশ জুড়ে যার এত যশখ্যাতি, তার পক্ষে কী করে সম্ভব হয়েছিল ভরা মজলিসে নিজের দোষ স্বীকার করে একজন ছাত্রকে উস্তাদের আসনে স্থান দেয়া? এই ঘটনা উল্লেখ করার পর ইমাম কুরতুবী (রহ.) নিজের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন,

فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين ، الاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ: مِن رجلٍ ظهرت رياسته ، واشْتَهرتْ نفاسته ؛ لغريبٍ مجهول العين لا يعرف من؟ ولا من أين؟ فاقتدوا به ترشدوا

‘আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের সকলের প্রতি রহম করুন; দেখুন দীন হচ্ছে কত মজবুত ভিত্তির নাম। কীভাবে একজন সম্মানী ব্যক্তি, যার সুনাম-সুখ্যাতি দেশ জুড়ে বিস্তৃত, তিনি ভরা মজলিসে একজন অপরিচিত, অখ্যাত ব্যক্তির সামনে নিজের ইলমের ত্রুটি প্রকাশ করে তাকে সম্মানীত করছেন। অতএব, তাদের আদর্শ অনুসরণ করুন।’

পূর্বসূরী মহান ব্যক্তিত্বদের এমন নিরূপম ঘটনা আমাদেরকে বলতে অনুপ্রাণিত করে-

أولئك أبائي فجئنا بمثلهم * إذا جمعت يا جرير المجامع!

‘এঁরাই আমার পূর্বসূরী,

এদের নিয়ে গর্ব করি;

ওহে জারীর! দেখাও তুমি

বিশ্বসভায় তাদের জুড়ি।”

বড় সতীন

আমাদের পূর্বসূরীগণ ইলম অন্বেষণ, পঠন-পাঠন ও রচনা-সংকলনের কাজে এত বেশি মাত্রায় মগ্ন থাকতেন যে, তাদের স্ত্রীগণের কাছে এগুলো সতীনের চেয়েও ভারি মনে হতো! যেমন, যুবায়র ইবন আবূ বাক্কার (রহ.) বলেন, একবার আমার ভাগ্নি আমার স্ত্রীকে বলল, ‘স্ত্রীর পক্ষে আমার মামাই সবচেয়ে উত্তম। কেননা তিনি দ্বিতীয় কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং দাসীও গ্রহণ করেননি।’ জবাবে আমার স্ত্রী বললেন,

تقولُ المرأةُ (أي زوجته) والله لَهَذه الكتب أشدُّ عليَّ من ثلاثِ ضرائر

‘মহিলা (তার স্ত্রী) বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার মামার এই কিতাবগুলো তিনজন সতীনের চেয়েও আমার কাছে বেশি কঠিন!’

মৃত্যুলগ্নেও ইলম সাধনা

মৃত্যুক্ষণ জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে ওই সময়ের প্রকৃত পরিস্থিতি উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কেননা এই

ঘটনা মানুষের জীবনে একবারই আসে। আর যার কাছে আসে সে চিরদিনের জন্য অপারে চলে যায় এবং ফিরে আসতে পারে না। ফলে কেউ সেই পরিস্থিতির কথা যথাযথভাবে ব্যক্তও করতে পারে না। তবু মা বাবা, ছেলেসন্তান, স্ত্রী-পরিজন, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অচেনা-অজানা দেশে রওয়ানা দেয়ার কষ্ট কিছুটা হলেও অনুধাবন করা যায়। জীবিতরা একেবারে সামান্য হলেও সে কথা অনুধাবন করতে পারি। সেই অনুধাবনশক্তি থেকে বলতে পারি, এই সময়টা কেবলই বিহবলতার, ভয়ের, আতঙ্কের। তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সেই সময়ে ইলম হাসিল, ইলম বর্ধনের চিন্তাই আসার কথা নয়। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীগণ এই নাযুক মুহূর্তেও ইলম বৃদ্ধি এবং দীনের উপকারার্থে ইলম হাসিল করার চেষ্টা করেছেন। তারা আমল করেছেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীর ওপর। যথা-

عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الإِسْلاَمَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার কাছে মৃত্যু হাজির হয় আর সে দীন যিন্দা করার জন্য ইলম হাসিল করে তবে তার এবং জান্নাতের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে একটিমাত্র দরজা।' [সুনানে দারামী: ৩৬২, যঈফ]

দীন যিন্দার এই প্রয়াস অতি প্রশংসনীয় বলেও হাদীছে ইরশাদ হয়েছে। যথা-

«مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ الْعِلْمِ، وَطَالِبُ الدُّنْيَا»

'দুই শ্রেণীর মানুষ কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। এক. ইলমের অন্বেষক এবং দুই. দুনিয়ালোভী।' [হাকেম, মুস্তাদরাক 'আলাস-সহীহাইন: ৩১২]

আমাদের পূর্বসূরীগণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্রবাণীগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-

إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة.

'কতদিন পর্যন্ত মানুষ ইলম হাসিল করবে? জবাবে তিনি বললেন, সিন্দুক থেকে কবর পর্যন্ত।'

নিম্নে হাদীছের ওপর আমলকারী কয়েকজন পূর্বসূরীর ঘটনা তুলে ধরা হলো।

১. ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর ঘটনা:

কারাশী (রহ.) 'আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর শাগরেদ ইবরাহীম ইবন জাররাহ তামিমী বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মৃত্যুশয্যায় হাজির হলাম। তখন তিনি বেহুঁশ ছিলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে

এলে আমাকে বললেন, হে ইবরাহীম! রময়ে জিমারের ক্ষেত্রে উত্তম কে, পদব্রজী নাকি সওয়ারী? আমি বললাম, সওয়ারী। তিনি বললেন, তুমি ভুল বলছ। তখন আমি শুধরে বললাম, তাহলে পদব্রজী। তিনি এবারও বললেন, তুমি ভুল বলছ! তখন আমি বাধ্য হয়ে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন, আপনিই তাহলে বিষয়টি বলুন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বললেন, যদি দু'আর জন্য সেখানে অবস্থান করা হয় তবে পদব্রজে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। আর যেখানে অবস্থান করা যায় না সেখানে সওয়ারী হয়ে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম।

এরপর আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি তার ঘরের মূল ফটক পর্যন্তও পৌঁছিনি, এমন সময় কান্নার শব্দ পেলাম। তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগেও তার মধ্যে ইলম অন্বেষণের প্রতি ছিল এমন ব্যগ্রতা!

২. আহত আবূ যুরআ রাযীর (রহ.) মৃত্যুর আগে হাদীছ বর্ণনা:

আবূ যুরআ (রহ.) আহত অবস্থায় মারা যান। তার কপাল থেকে আঘাতজনিত কারণে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সে সময় আবূ হাতেম (রহ.) মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করেন-

ما تحفظ في تلقين الموتى: لا إله إلا الله

'আপনি মৃতের তালকীন সম্পর্কে কী জানেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ?'

জবাবে মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম বলতে শুরু করলেন, মুআয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত...

তিনি কথাটি শেষও করতে পারলেন না। ইত্যবসরে যখম ও মাথায় পট্টি নিয়েই মুহাম্মাদ ইবন যুরআ মাথা উত্তোলন করে বললেন-

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

অর্থাৎ তিনি মুআয ইবন জাবালের পূর্বের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করে হাদীছ বর্ণনা করলেন যে, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [আবূ দাউদ: ৩১১৬, সহীহ]

হাদীছটি বর্ণনা করা মাত্রই ঘরে কান্নার রোল উঠল। কারণ হাদীছ বর্ণনা করে হাদীছ অনুযায়ী আমল করেই তিনি দুনিয়াকে সালাম জানালেন।

৩. আবূ জাফর তাবারী (রহ.)-এর মৃত্যুকালীন জ্ঞানসাধনা:

‘আল-জালিসুস সালেহ’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি আবূ জাফর তাবারী (রহ.)-এর ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তার সামনে উপস্থিত হলেন। সে সময় তার সামনে এই দু‘আটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো-

يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحمًا بعد الموت

জবাবে তিনি সহীফা তলব করলেন এবং লিখে দিলেন। তাকে বলা হলো, এই নাযুক সময়েও ইলমচর্চা? উত্তরে তিনি বললেন-

ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلمِ حتى يموت

'মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুক্ষণেও ইলম অন্বেষণের কোনো সুযোগ হাতছাড়া না করা।' [আল-জালিসুস সালেহ: ৩/২২২]

ইয়াকুত আল-হামাবী (রহ.) ইরশাদুল আদীব গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ফকীহ ওয়ালওয়ালেজী (রহ.) বলেন, আমি আবূ রায়হান মুহাম্মদ ইবন আহমাদ খারেজমী (রহ.) এর কাছে গমন করলাম। সে সময় তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং তার বুকের ভেতর থেকে মৃত্যুর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেই নাযুক সময়ে তিনি আমাকে বললেন, আপনি নানীর মীরাছের মাসআলা সম্পর্কে সেদিন কী যেন বলেছিলেন? আমি বললাম, এই নাযুক সময়ে সেই মাসআলার আলোচনা করতে হবে? তিনি জবাবে বললেন-

يا هذا! أُوَدِّعُ الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرًا من أن أُخلِّيها وأنا جاهلٌ بها

'হে ব্যক্তি! একটি মাসআলা সম্পর্কে অবগত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া ওই মাসআলা সম্পর্কে জাহেল থেকে বিদায় নেয়ার চেয়ে উত্তম নয় কি?'

আমি তার কথার কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। তাই মাসআলাটি পুনরায় ব্যক্ত করলাম। আর তিনি মুখস্থ করলেন। এরপর আমি তার

ঘর থেকে বের হয়ে এলাম এবং রাস্তার মাঝখানে আছি এমন সময় তার পরিবার থেকে মৃত্যুর কান্না শুনতে পেলাম।

বার্ধক্যেও তারুণ্যের উদ্দীপনা

আজ আমরা তারুণ্যের শাণিত খুনেও নিজেকে মেলে ধরতে পারি না। অকর্মন্য, অলসতা, গাফলত আমাদেরকে ভয়ানকভাবে জেঁকে ধরেছে। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীগণ ছিলেন এমন, যাদের ইলম অন্বেষণ ও জ্ঞানসাধনার কাছে বার্ধক্য হার মানতে বাধ্য হতো। বার্ধক্যকে জয় করে চিরতরুণের মতো ইলমী তারাক্কীর জন্য মেহনত করেছেন। বিখ্যাত মনীষী শিহাবুদ্দিন আবূল আব্বাস আহমাদ ইবন আবূ তালেব (রহ.)-এর কথা চিন্তা করুন। তিনি তখন একশত দশবছরের অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু মনের তারুণ্য কত বেগবান! এসময় এমনিতেই বয়সের ছাপে নিষ্কর্ম হওয়ার কথা। তারপর যদি মৃত্যুকালীন সময় হয় তবে তো কথাই নেই। কিন্তু বার্ধক্য আর মৃত্যুর যাকান্দানী ভোঁতা প্রমাণিত হলো তার কাছে। এই বয়সে যেদিন মারা গেলেন সেদিনও ছাত্রদেরকে পুরোদস্তুর দরস দিলেন। যেন দরস ছিল প্রাক-বিবাহ প্রস্তুতি আর মৃত্যু ছিল পালকি! মহান আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগের সময়টাকে তাই মিলিত হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করলেন। প্রিয় মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগের সময়টাতে মানুষ কত পুলকবোধ করে! শিহরিত হয়! আনন্দে উদ্বেলিত হয়। তাই মিলনকে স্বার্থক করার জন্য নানা রকমের প্রস্তুতি নেয়। আমাদের পূর্বসূরীগণও সবচেয়ে প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতিটাই নিতেন। সেটা

হতো ইলমের চর্চা। বন্ধুর কাছে যে ইলমের দাম বেশি, অনেক বেশি! ইলমই যে তার কাছে সবচেয়ে দামি সুবাস! তাই যাওয়ার আগে দেহে এই ইলমের সুবাসই মেখে যেতেন তারা!

আমাদের কি এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত নয়? যেখানে আমরা তরুণরাই বার্ধক্যপীড়িতদের চেয়েও বেশি বুড়িয়ে গেছি! ফলে অলসতা, গাফলতি আমাদের নিতসঙ্গী হয়েছে! পূর্বসূরীগণদের অনেকের ব্যাপারে জানা যায়, তারা বার্ধক্যেও তরুণদের চেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত, আগ্রহী ছিলেন। বয়সের ভার তাদেরকে নোয়াতে পারেনি। বার্ধক্য যাদের জ্ঞানসাধনার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি।

আবূল ওয়াফা ইবন আকীল হাম্বলী (রহ.) বলেন,

إني لأجد من حِرْصي على العلم وأنا في عَشْرِ الثماني أشدّ مما كنت أجده وأنا ابنُ عشرين سنة

‘আমি ইলম অন্বেষণে আশি বছর বয়সে বিশ বছর বয়সের চেয়ে বেশি স্বাদ ও উদ্দীপনা পাই।’ [আয-যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা: ১/১৪৬]

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ইলম ও আলেমের ফযীলত, এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছ, সাহাবায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দীনের বক্তব্য, তাঁদের বিস্ময়কর নানা ঘটনা উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে আমরা ইলম শিক্ষার কিছু জরুরী আদব ও নিয়ম-কানুন উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

ইলম, আলেম, ছাত্র-সহপাঠী, মাদরাসা ও উস্তাদদের সঙ্গে আচার-আচরণ ও ব্যবহারবিধি প্রসঙ্গে:

প্রথম পর্ব:

ইলম অর্জনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এক. ইলম অর্জনের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং দুনিয়াবী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের নিয়ত থেকে বেঁচে থাকা। কেননা ইলম হচ্ছে একটি ইবাদত। যেমন পূর্বসূরীগণ বলেন, طلب العلم عبادة

আর যেহেতু ইলম ইবাদত, তাই এই ইবাদত পালনে সুদৃঢ় ইচ্ছা থাকা চাই। আর সর্বাগ্রে চাই নিয়তের বিশুদ্ধতা। অবশ্য কখনও কখনও এমন অপরিণত বয়সে মাদরাসায় আসা হয় যখন নিয়ত সম্পর্কে তালেবে ইলমের কোনো ধারণাই থাকে না। এরা পরে নিয়ত ঠিক করে নেবে। অনেক সময় শিখতে শিখতেই নিয়ত ঠিক হয়ে যায়। ইবন মুবারক (রহ.) বলতেন,

طلبنا العلم وليس لنا فيه نية

'আমরা ইলম শিক্ষা করেছি, অথচ আমাদের তখন কোনো নিয়তই ছিল না।' তবে যখন নিয়ত করার মতো বুঝ হবে তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরই নিয়ত করতে হবে। পূর্বসূরীগণ বলতেন, ইলমের নিয়ত হচ্ছে অজ্ঞতা দূর করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-

বন্দেগি যথাযথভাবে পালন করার ইচ্ছা করা। আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলতেন,

النية في العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك

‘ইলমের নিয়ত হচ্ছে নিজের মধ্যকার জাহালত তথা অজ্ঞতা দূর করা।’

নিজের মধ্যকার কীসের অজ্ঞতা দূরা করা? জাহালত হচ্ছে বড় তিনটি দোষের নাম। যথা, রব সম্পর্কে অজ্ঞতা, দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। প্রতিটি নর-নারীকে কবরে এই তিনটি বিষয়েই প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং এই প্রশ্নগুলোর সমাধান থেকে গাফেল থাকার নামই হচ্ছে জাহালত বা অজ্ঞতা। আর ইলমে নাফের মাধ্যমে এই তিনটি বস্তুর অজ্ঞতা দূর করা যায়। রব সম্পর্কে জাহালত দূর করার ফলে বান্দা আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ, একমাত্র তিনিই ইবাদত-বন্দেগীর যোগ্য হওয়া, তাঁর সিফাত ও গুণাবলী, মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক ইলম হাসিল করতে সক্ষম হবে। আর দীনের বিষয়গুলো দালিলিকভাবে আত্মস্থ করার ফলে দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যথাযথ ইলম হাসিল হওয়ায় তাঁর হক, গুণাবলি, উম্মতের প্রতি তাঁর অবদান, তাঁর সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার অপরিহার্যতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হাসিল হবে।

সুতরাং ইলম হাসিলে প্রথম নিয়ত থাকতে হবে নিজের মধ্যকার অজ্ঞতা দূর করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর দীন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হাসিল করা।

এসব নেক নিয়তেই ইলম হাসিল করবে। পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করবে না। যেমন, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতি, সুনাম-সুখ্যাতি কিংবা অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ইত্যাদি হীন উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করবে না। এমনিভাবে জাগতিক কোনো স্বার্থে প্রয়োগ করে ইলম ও তালিমকে অপদস্ত না করা, যদিও তা হাদিয়ার নামে হয়। সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (রহ.) বলতেন,

كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته نسأل الله المسامحة

'আমাকে কুরআনের সমঝ দান করা হয়েছিল। কিন্তু যখনই আবূ জাফরের কাছ থেকে হাদিয়ার থলি গ্রহণ করেছি তখন তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন।'

যে কোনো ইলমী পদক্ষেপের আগে নিয়ত সহীহ করে নেওয়া একান্ত জরুরী। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

وددت أن الخلق تعلموا مني هذا العلمِ على أن لا ينسب إلي حرف منه الله ما ناظرت أحداً قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحداً أن يظهر على يديه وقال: ما كلمت أحداً قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ

‘আমি কামনা করি সারা বিশ্বের মানুষ আমার কাছ থেকে ইলম হাসিল করুক কিন্তু কেউ যেন এই ইলমের একটি হরফও আমার দিকে সম্বোধন না করে।’ তিনি আরো বলতেন, ‘আমি কখনই কারো সঙ্গে প্রাধান্য বিস্তার কিংবা বিজয় লাভের জন্য বিতর্ক করিনি। বরং যখন মোনাজারা করেছি তখন মনেপ্রাণে কামনা করেছি যাতে প্রতিপক্ষ হক ও সত্যের এবং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সাহায্য পান।’

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলতেন,

يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوه

‘হে কওম! আমি ইলম শিক্ষা দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকেই কামনা করি। কখনও আমি ইলমের মজলিস কায়েম করে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি।’

নিয়ত বিশুদ্ধ করে ইলম শিক্ষা করতে হবে, মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ বা তাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করা যাবে না। শিক্ষা করতে হবে শুধু ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য। তাফসীরে আলবাহরুল মাদীদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

ولما أراد موسى عليه السلام أن يفارقه، قال له: أوصني، قال: لا تطلب العلم لتحدث به، واطلبه لتعمل به. هـ

‘মুসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর সেই বিখ্যাত ঘটনার পরিসমাপ্তিতে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময় মূসা (আ.) খিজির (আ.)-কে

কিছু উপদেশ প্রদানের অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, বাহাছ করার জন্য কিংবা বয়ান করার নিয়তে ইলম শিক্ষা করবেন না, বরং ইলম শিক্ষা করবেন একমাত্র আমল করার নিয়তে।' [আল-বাহরুল মাদীদ: ১১/২৭৭]

দুই. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহর মোরাকাবা করা

আলেম ও তালেবে ইলমের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, যাবতীয় কাজকর্ম, চালচলন এবং কথাবার্তায় আল্লাহকে ভয় করা। কেননা, একজন আলেম তার প্রাপ্ত ইলম ও জ্ঞানবৃদ্ধির আমানতদার। এই আমানতদারী রক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন-

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾ [الانفال: ٢٧]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ-রাসূল এবং তোমাদের স্বীয় আমানতের খেয়ানত করো না।' {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৭}

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন, 'ইলম মুখস্ত বিদ্যার নাম নয়। ইলম হচ্ছে উপকারিতার নাম।'

আর আলেমের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভারিত্ব, গাম্ভীর্য, বিনয় ও নম্রতা বজায় রেখে চলা। ইমাম মালেক (রহ.) হারুনুর রশীদকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন-

إذا علمت علماً فلْيُرَ عليك أثره، وسكينته وسمته، ووقاره، وحلمه. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الانبياء

'যখন ইলম হাসিল হবে তখন এর কোনো আছর, ভাবগাম্ভীর্য, সহনশীলতা এবং উচ্চতা আপনার মধ্যে প্রকাশ পাওয়া চাই। কেননা ইলম হচ্ছে নবীগণের উত্তরাধিকার।'

মু'জামে ত্বাবারানীতে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ، وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ»

'ইলম শিক্ষা করো এবং ইলম শিক্ষার জন্য গাম্ভীর্য ও বিনয়ের গুণ অর্জন করো। আর যারা ইলম শিক্ষা করতে আসে তাদের প্রতি বিনয়ী হও।' [মু'জামুল আওসাত: ৬১৮৪, যঈফ]

সালফে সালেহীন বলতেন,

حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه

'আলেমের কর্তব্য হচ্ছে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ তা'আলার জন্য বিনয়ী হওয়া। নিজের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকা এবং যে কাজ প্রশ্নের সম্মুখীন করে তা থেকে বিরত থাকা।'

তিন. ইলমের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা

আল্লাহ তা‘আল ইলমের যে ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন পার্থিব কোনো লালসায় পড়ে সেই ইজ্জত ও সম্মান নষ্ট না করা চাই। দুনিয়াদার কোনো লোকের কাছে বিনা কারণে কিংবা অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া আলেমের না যাওয়া উচিত। এমনকি দুনিয়াদার কোনো লোককে ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের ঘরে না যাওয়া, যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাজা-বাদশা হন না কেন। বরং ইলমের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে তাদেরকেই দরসগাহে আসতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা।

এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি জীবনে মোট চারবার বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। চতুর্থ ও সবচেয়ে বড় বিপদটি ছিল ইলমের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে। আর এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল তার জীবনের শেষ বয়সে। শেষ বয়সে তিনি বুখারাতেই বসবাস করছিলেন। সে সময় বুখারার আমীর ছিলেন খালেদ যুহলী। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন ঘরে এসে তার সন্তানদেরকে দীনী ইলম শিক্ষা দেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বললেন আমীর ও বাদশাদের ঘরে ঘরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে আমি ইলমে হাদীছকে অপমানিত করতে চাই না। কেউ পড়তে চাইলে সে আমার কাছে এসে আমার দরসে শরীক হয়ে পড়ুক। আমি ফেরিওয়ালা নই যে, এই ইলম নিয়ে বাদশাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবো! এটা ইলমে নববীর মর্যাদার খেলাফ।

তার জবাব পেয়ে আমীর দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি বললেন, তাহলে আপনার দরসে একটা স্বতন্ত্র মজলিস কায়েম করা হোক। সেই মজলিসে কেবল আমার সন্তানেরাই লেখাপড়া করবে, অন্য কেউ তাতে শরীক হতে পারবে না।

ইমাম বুখারী (রহ) এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি অন্যদেরকে ইলম হাসিল করা থেকে বঞ্চিত করলাম কিংবা বাধা দিলাম।

আমীর মনে করেছিলেন অন্যদের সঙ্গে তার সন্তানদের পড়ালেখা তার জন্য অবমাননাকর। তাই তিনি আলাদা একটি মজলিস কায়েমের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু যারা এক সঙ্গে বসে ইলম হাসিল করাকে অবমাননাকর ভাবে তাদের জন্য দরসের আলাদা মজলিস কায়েম করা ইমাম বুখারী (রহ)-এর দৃষ্টিতে চরম আপত্তিকর বলে মনে হলো। ফলে তিনি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন। কিন্তু আমীর খুব বেশি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ফলে বাধ্য হয়ে ইমাম বুখারী (রহ) বললেন, হ্যাঁ, এক কাজ করা যেতে পারে। আপনি যদি এই মর্মে শাহী ফরমান জারি করেন যে, বুখারীর মজলিসে সাধারণ ছাত্ররা বসতে পারবে না তখন আমি অপরাগ বিবেচিত হবো এবং তখন বিষয়টি ভেবে দেখব। হয়ত ওই সময় আপনার সন্তানের জন্য আলাদা দরস কায়েম করা যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আম জলসার অনুমতি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কারও জন্য আলাদা মজলিস কায়েম করতে পারব না।

ইমাম বুখারী (রহ)-এর এই প্রস্তাবে আমীর চরম নাখোশ হলেন এবং এর প্রতিশোধ নিতে তিনি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করলেন। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তার নামে তিনি নানারকম মিথ্যা রটনা করতে থাকেন এবং হাজার রকম অপবাদ দেওয়া শুরু করেন। এভাবে তাকে বুখারা থেকে বের করে দেয়ার জোর তৎপরতা শুরু হয় এবং এসব ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও মিথ্যা অপবাদের সূত্র ধরে একপর্যায়ে তাকে বুখারা থেকে বের করে দেয়ার আদেশও জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এই প্রিয় বান্দার বদদু'আ কার্যকর হতে সময় লাগে নি। ফলে স্বয়ং আমীর খালেদই সীমাহীন অপদস্থ হন। খলীফা তাকে বরখাস্ত করেন এবং তার আদেশে গভর্নরকে গাধায় চড়িয়ে সারা শহর ঘুরানো হয়।

ইসলামী ইতিহাসে এধরনের আরো অনেক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। একবার খলীফা মাহদী ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে তার দুই সন্তানকে পড়ানোর জন্য আবেদন করলে তিনি বললেন-

العلم أولى أن يوقر ويؤتى وفي رواية: العلم يزار ولا يزور ويؤتى ولا يأتي وفي رواية: أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون

'ইলমের শান হচ্ছে একে সম্মান করা এবং হাসিল করার জন্য ইলমের কাছে আসা। অন্য বর্ণনামতে, ইলম দর্শনার্থ; দর্শনার্থী নয়। একে হাসিল করতে আসতে হয়। এ কারো কাছে যায় না। আমি আহলে ইলমকে পেয়েছি, তারা ইলম বিস্তার করতে কারো কাছে

ঘুরে বেড়াতেন না বরং ইলম শিখতে হলে তাদের কাছে আসতে হতো।’

তিনি আরো বলেন, একবার আমি খলীফা হারুনের কাছে গমন করলে তিনি আমাকে বললেন, আপনি বারবার আমাদের কাছে আসবেন। যাতে ঘরের বাচ্চারা আপনার কাছে মুআত্বা পাঠ করতে পারে। ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে সম্মানীত করুন। আমি তো দেখছি ইলম আপনাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে!... ইলম কারো কাছে যায় না। ইলমের কাছে যেতে হয়।’

খলীফা বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর বাচ্চাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা মসজিদে যাও এবং অন্যদের সঙ্গে ইলম শিক্ষা করো।

বর্ণিত আছে, একবার হারুনুর রশীদ তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার বসবাসের ঘর আছে? জবাবে তিনি বললেন না। তখন খলীফা তাকে তিন হাজার দিনার দিয়ে বললেন, এগুলো দিয়ে ঘর বানাবেন। ইমাম মালেক (রহ.) দিনারগুলো গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু খরচ করলেন না। এর কিছুদিন পর খলীফা ইরাক পরিদর্শনে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ইমাম মালেক (রহ.)-কে সঙ্গে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। জবাবে ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, আপনার সঙ্গে যাওয়ার পরিকল্পনা আমার নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ »

‘মদীনা তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা অনুধাবন করে।’ [মুসলিম: ১৩৬৩]

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَدِينَةُ تَنْفِي خَبَثَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»

‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনা নগরী পাপ দূর করে যেভাবে হাপড় লোহার মরিচা দূর করে।’ [শারহু মা‘আনিল আছার: ১৮২৬; বুখারী: ৭২০৯ {বুখারীর বর্ণনা কিছুটা ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।]

এরপর তিনি বললেন, এই নিন আপনার দেওয়া সেই দিনারসমূহ। এই দিনারের কারণেই আপনি আমাকে মদীনা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন। আমি ওই সময়েই এই আশঙ্কা করেছিলাম এবং সে কারণেই দিনারগুলো স্বস্থানে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আমি কখনই দীনের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেব না।’

সাধারণ মানুষ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্মান করতে হবে বটে কিন্তু তাদেরকে তোয়াজ ও মাত্রাতিরিক্ত খাতির করা যাবে না। এক্ষেত্রে সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-এর ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, হারুনার রশিদ খলীফা হিসেবে নিযুক্ত হলে দেশের প্রায় সব আলেম তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন।

কিন্তু সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) এলেন না। অথচ দুইজনের মধ্যে এর আগে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নবনিযুক্ত খলীফা হারুনের কাছে ব্যাপারটি কষ্টদায়ক মনে হলো। তাই তিনি সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-এর কাছে একটি চিঠি লিখলেন। যার ভাষা ছিল নিম্নরূপ:

আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটি আমীরুল মুমিনীন হারুনের পক্ষ থেকে দীনী ভাই সুফিয়ান ছাওরীর উদ্দেশ্যে লিখিত।

পরসমাচার, হে বন্ধু! আপনি জানেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনীনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। সেই সূত্রেই আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি। এই বন্ধুত্বের মধ্যে সামান্যতম কৃত্রিমতা আছে বলে আমি মনে করি না। আল্লাহ তা'আলা যদি আমার ঘাড়ে এই দায়িত্বের বোঝা না চাপাতেন তাহলে অবশ্যই আমি আপনার সমীপে হাজির হতাম এবং তা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। কেননা আমি আপনার শূন্যতা খুব বেশি অনুভব করছি। আর অন্যান্য পরিচিতজনের সবাই আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে গেছেন এবং আমাকে আমার দায়িত্ব গ্রহণের কারণে সাধুবাদ জানিয়েছেন। শুধু আপনি একাই আছেন, যিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেননি। তবে অন্যের তুলনায় আমি আপনার সাক্ষাতকেই বেশি পছন্দ করি।

আমি আমার মালের ভাণ্ডারের মুখ খুলে দিয়েছি। এতে আমি সন্তুষ্ট, আমার চোখ এতে শীতল হয়। এমন এক সুসময়ে আপনার অনুপস্থিতি আমাকে নিদারুণ মর্মাহত করছে। তাই বাধ্য হয়ে আপনার কাছে পত্র লেখা। এতে আমি আমার ভালোবাসা ও প্রবল

আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছি। হে আব্দুল্লাহ! আপনি তো জানেন মুসলিমের সঙ্গে মুসলিমের সাক্ষাত ও ভ্রাতৃত্বের ফযীলত কত বেশি! সুতরাং এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসবেন বলে আশা রাখি।’

চিঠিটা লিখে খলীফা হারুন আব্বাদ তালেকানীর হাতে দিলেন এবং এর গুরুত্ব বুঝিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত তা সুফিয়ান ছাওরীর হাতে পৌঁছে দেয়ার আদেশ দিলেন।

আব্বাদ তালেকানী (রহ.) বলেন, আমি চিঠিটা গ্রহণ করে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। সেখানে গিয়ে আমি সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-কে মসজিদে দরস প্রদান করতে দেখলাম। আমি মসজিদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু তিনি আমার দিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না বরং তীর্যকভাবে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আগন্তুকের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’

আব্বাদ বলেন, এরপর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। অথচ তখন সালাতের সময় ছিল না। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর ছাত্রদের সালাম দিলাম। কিন্তু ছাত্ররাও কেউ সালামের জবাব দিলেন না, এমনকি মাথা পর্যন্ত উঠালেন না।

আমি অনেকক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠলাম। কেউ আমাকে বসার কথাটুকুও বললেন না। তাদের এই আচরণ আমাকে হতবাক করে দিল। অগত্যা আমি দূর থেকেই সুফিয়ান ছাওরীর (রহ.) উদ্দেশ্যে খলীফা হারুনের লেখা চিঠিটি ছুঁড়ে মারলাম।

তিনি চিঠিটি পেয়ে কেঁপে উঠলেন। যেন তাঁর মেহরাবে ভয়ানক কোনো সাপ কিংবা বিচ্ছু ঢুকে পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পতিত হলেন এবং সালাম ফিরিয়ে জেবে হাত ঢুকালেন এবং পেছনের একজনকে তা পড়ার ইঙ্গিত করে বললেন, আমি ওই বস্তু স্পর্শ করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি ও তার কাছে ক্ষমা চাই, যে বস্তু (চিঠি) একজন জালেম তার হাতে স্পর্শ করেছে। কিন্তু ছাত্ররা কেউ তা স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়ালেন না। আর তিনিও কাঁপছিলেন, যেন এটা চিঠি নয়- বিষাক্ত সাপ!

অবশেষে একজন ছাত্র চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলেন। তার পড়া শুনে সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) অবাক হয়ে মিটিমিটি করে হাসছিলেন। ছাত্রের পড়া শেষ হলে সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বললেন, এই চিঠির অপর পিঠেই জালেম বরাবর জবাব লিখে দাও!

কেউ একজন বললেন, হে আব্দুল্লাহ! হারুন একজন খলীফা, তাকে নতুন একটা কাগজে জবাব দিলে ভালো হয় না? তিনি বললেন, জালেমের কাছে চিঠির উল্টো পিঠেই জবাব লিখে দাও। কেননা, সে যদি হালালভাবে তা উপার্জন করে থাকে, তাহলে এটাই যথেষ্ট। আর যদি হারাম উপার্জন হয় তাহলে সে এই হারামের আগুনে জ্বলবে। আর আমরা জালেমের হাত স্পর্শ করা কোনো হারাম বস্তু এখানে রেখে দিতে চাই না। কেননা, তা আমাদের দীনকে বরবাদ করবে। তাকে বলা হলো; চিঠির জবাবে কী লেখা হবে? তিনি বললেন, লিখ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ তা‘আলার বান্দা সুফিয়ানের পক্ষ হতে আশা-আকাঙ্ক্ষায় ধোঁকা খাওয়া-প্রতারিত হারুনের প্রতি-যার ঈমানের স্বাদ ও কুরআন তিলাওয়াতের মজা কেড়ে নেওয়া হয়েছে- পরসমাচার, তোমাকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি তোমার বন্ধুত্বের রশি ছিন্ন এবং ভালোবাসার বন্ধন কর্তন করে ফেলেছি। তুমি নিজেই চিঠির মাধ্যমে আমাকে অবহিত করেছ যে, তুমি মুসলিমের সম্পদ উন্মুক্ত করে তার অপব্যবহার শুরু করেছ। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে তা খরচ করছ। তুমি শুধু অন্যায় করেই ক্ষান্ত হও নি। বরং আমাকে তোমার পাপের সাক্ষীও বানিয়েছ!

অতএব, আমি এবং আমার সঙ্গে যারা তোমার চিঠি পাঠের সময় উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই আগামী দিন ন্যায়পরায়ণ মহান বিচারক আল্লাহর কাছে এর যথাযথ সাক্ষ্য পেশ করবেন। হে হারুন! তুমি মুসলিমের সন্তুষ্টি ছাড়া তাদের সম্পদের কোষাগার খুলে দিয়েছ। তোমার কাজে কি যাকাত উসূলকারী, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ এবং অভাবীরা সন্তুষ্ট? আহলে ইলম এবং কুরআনের বাহকরা কি তাতে সম্মত? ইয়াতিম বিধবা নারীরাও কি তাতে সন্তুষ্ট? অথবা সন্তুষ্ট তোমার প্রজারা?

হে হারুন! তুমি তোমার কোমরের কাপড় বেঁধে নাও এবং জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দাও। বিপদ প্রতিহত করার জন্য চাদর জড়িয়ে নাও। তুমি জেনে রেখ, অতিসত্ত্বর তোমাকে ন্যায়পরায়ণ বিচারকের সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে

ভয় কর। কেননা, তোমার কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ মিটে গেছে, ইলম ও যুহদের মজা নিঃশেষ হয়ে গেছে। নেককার ও সৎ লোকের সান্নিধ্য তোমার অপ্রিয় লাগা শুরু হয়েছে। আর তুমি জালেম ও জালেমের সহায়তাকারী হওয়া পছন্দ করছ!

হে হারুন! তুমি সিংহাসনে আরোহন করা মাত্রই রেশমি পোশাক পরিধান করা শুরু করেছ! তোমার দরজার সামনে পর্দা টাঙিয়ে রাব্বুল আলামীনের শক্তির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করেছ! এরপর তুমি এমন জালেম প্রহরীদেরকে পর্দার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ, যারা নিজেরা জালেম, মানুষের প্রতি ইনসাফ করে না। তারা শরাবপানকারীদেরকে দণ্ড দেয় অথচ নিজেরাই শরাব পান করে! তারা ব্যভিচারিদেরকে বেত্রাঘাত করে অথচ নিজেরাই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়! চোরের হাত কাটে আবার গোপনে নিজেরাই চুরি করে! এসব শাস্তি অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার আগে নিজেদের ওপরই কি প্রয়োগ করা উচিত ছিল না?

আগামী দিন কী হবে হে হারুন! যে দিন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক একথার ঘোষণা করবেন যে, জালেম ও জালেমের সহায়তাকারীদেরকে একত্রিত করো। আর সেদিন তুমি ঘাড়ে দুহাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার সামনে দণ্ডায়মান হবে?

তোমার ইনসাফ তোমাকে বাঁধন থেকে মুক্তি দেবে নাকি তোমার আশেপাশের জালেমরা তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? অথবা

তুমি তাদের জাহান্নামে টেনে নেবে? যেমন ফেরাউনের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۝٩٨ ﴾ [هود: ٩٨]

‘সে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান!’ {সূরা হুদ, আয়াত: ৯৮}

হে হারুন! আমি অনুভব করতে পারছি, তুমি তোমার নেককর্ম দেখতে পাবে অন্যের পাল্লায় আর অন্যের পাপ দেখবে তোমার পাল্লায়। বিপদের ওপর বিপদ এবং অন্ধকারের ওপর অন্ধকার। অতএব, হে হারুন! তুমি তোমার প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ব্যাপারে সজাগ থাকো।

তুমি আরো জেনে রেখো, এই রাজত্ব ও খেলাফত তোমার কাছে চিরদিনের জন্য আসেনি। অতিসত্ত্বর তা অন্যের কাছে স্থানান্তরিত হবে। দুনিয়া এভাবেই একের পর আরেকজনকে নিয়ে খেলা করে। তাদের মধ্যে কেউ আছে যে পাথেয় সঞ্চয় করে আর কেউ আছে যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিকে বরবাদ করে।

তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এরপর তুমি কখনও আর আমার কাছে চিঠি লিখবে না। লিখলে আমি তার জবাব দেব না।

-ওয়াসসালাম

এরপর তিনি চিঠিটা ভাঁজ ও দস্তখত করা ছাড়াই আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। আমি তা গ্রহণ করলাম এবং কূফার বাজারের দিকে ছুটলাম। সুফিয়ান ছাওরীর প্রতিটি কথা ও আচরণ আমার মধ্যে রূপান্তরের ঝড় বইয়ে দিল। তার উপদেশমালা সমুদ্রের ঊর্মিমালা হয়ে আমার হৃদয়পাড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। বাজারে গিয়ে আমি উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলাম- ওই ব্যক্তিকে কে ক্রয় করবে, যে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় পলায়ন করতে ইচ্ছুক?

বাজারের লোকজন আমার ঘোষণা শুনে দিনার দিরহাম নিয়ে হাজির হলো। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করে বললাম, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। বরং একটি পশমের জুব্বা দরকার। এগুলো কে দিতে পারবে?

আমাকে এগুলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। আমি শাহী লেবাস ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এবং ওই মোটা জুব্বা পরিধান করে নগ্নপদে হারুনের দরবারে উপস্থিত হলাম। দরবারের রক্ষী আমাকে এই অবস্থায় দেখে আটকে দিল। আমি পুনরায় অনুমতি চাইলাম। খলীফা আমাকে দেখে ফেললেন এবং আক্ষেপ ও নিজের প্রতি অনুযোগ করে বললেন, 'প্রেরিত সফল হয়েছে আর প্রেরক ব্যর্থ হয়েছে।'

আমি তার দিকে সেভাবেই চিঠিটি ছুঁড়ে মারলাম যেভাবে সুফিয়ান ছাওরী আমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। খলীফা চিঠিটি অত্যন্ত

মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলেন এবং পাঠ করে বিপুল পরিমাণে অশ্রুপাত করলেন।

চিঠির ভাষ্য কতক দরবারী লোককে পীড়া দিল। তাদের একজন প্রস্তাব দিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন! সুফিয়ান ছাওরী আপনার প্রতি চরম দুঃসাহস দেখিয়েছেন। অতএব তাকে পাকড়াও করে কঠোর সাজা দিন। জেলের ঘানি টানার ব্যবস্থা করে দিন। অন্তত অন্যরা এ থেকে শিক্ষা পাবে।

হারুন বললেন, হে দুনিয়ার দাসকুল! সুফিয়ানকে তার অবস্থায় থাকতে দাও। প্রতারিত ও হতভাগা সে, যার সান্নিধ্যে তোমরা আছো। সুফিয়ান তো সুফিয়ানই সুফিয়ানই!

এরপর তিনি আদেশ দিলেন, প্রতিবার দরবার বসার আগে যেন তার এই চিঠিটি পাঠ করে শোনানো হয়। [আল-আহকামুস সুলতানিয়া: ২/১৬১-১৬৩]

আমাদের পূর্বসূরী আলেমগণ ইলমের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার ব্যাপারে এরকমই তৎপর ছিলেন। ইলমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে কখনও তারা রাজন্যবর্গকে প্রশ্রয় দেননি। ইতিহাসে এরকম হাজারও ঘটনা সংরক্ষিত আছে। খতীব বাগদাদী (রহ.) হাম্মাদ ইবন সালামা (রহ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি হাম্মাদ ইবন সালামা (রহ.)-এর নিকট গমন করলাম। আমি তার সঙ্গে বসা আছি এমন সময় মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মানের দূত দরজায় করাঘাত করল। অতপর সে ঘরে প্রবেশ করে সালাম প্রদান করল

এবং মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মানের প্রেরিত চিঠি পেশ করল। হাম্মাদ বললেন, তুমি পড়ো। চিঠিতে সালাম ও দু‘আর পর উল্লেখ করা হয়েছে, আমার একটি মাসআলাগত সমাধান প্রয়োজন। দয়া করে চিঠিটি পাওয়ার পর আমার কাছে আগমন করবেন। আপনার কাছ থেকে মাসআলার সমাধান জেনে নেব।’

জবাবে হাম্মাদ ইবন সালামা (রহ.) বললেন, চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখে দাও যে, ‘আমরা আমাদের পূর্বসূরীগণকে পেয়েছি তারা অন্যের কাছে যেতেন না। বরং যার সমস্যা হতো তিনিই সমাধানের জন্য আসতেন। অতএব আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে তবে আপনিই আমার কাছে আসুন। আর আপনি যদি আসেনই তবে একা আসবেন এবং পদব্রজে আসবেন। সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসবেন না এবং সওয়ারী হয়েও আসবেন না।’

এর কিছুক্ষণ পর পুনরায় দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। দরজা খোলা হলে দেখা গেল স্বয়ং মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান উপস্থিত! তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, কী ব্যাপার! আপনার দিকে তাকিয়ে প্রথমে আমার সারা শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল যে! তখন হাম্মাদ (রহ.) বললেন,

سمعت ثابتاً البناني يقول: سمعت انس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنَّ العالِمَ إذا أراد بعلمِه وجهَ اللهِ هابه كلُّ شيءٍ، وإن أراد أن يكنِزَ به الكنوزَ هاب من كلِّ شيءٍ .

‘আমি ছাবেত বুনানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আনাছ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করে পৃথিবীর সব মাখলুক তাকে সমীহ করে। আর যদি দুনিয়ার কোনো সম্পদ পাওয়ার লোভে ইলম হাসিল করে তবে সে পৃথিবীর সবাইকে ভয় পায় ও সমীহ করে।’ [জামে ছগীর: ৩৮৩; আলবানী, সিলসিলা যয়ীফা: ৩৯২৮, যঈফ]

অবশ্য বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে এবং দীনী কল্যাণের প্রশ্ন হলে সেক্ষেত্রে নিয়ত ঠিক রেখে বিত্তশালী এবং রাজন্যবর্গের কাছে যাওয়াতে দোষ নেই। এমনিভাবে রাজন্যবর্গ যদি ইলমী মাকামের হয় তবে তাদের কাছেও যাতায়াত করাতে দোষ নেই। সালফে সালেহীনের অনেকেই শুধু এসব কারণে কখনও কখনও এরকম লোকদের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাদের কাছে গেছেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কখনই দুনিয়া কিংবা পার্থিব স্বার্থ ছিল না।

চার. যথাসম্ভব শরীয়ত নির্দেশিত যুহদ, দুনিয়াবিমুখতা, অনাড়ম্বরতার জীবনযাপন করা:

আর আলেমের এ বিষয়ের সর্বনিম্ন অবস্থা হচ্ছে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করা এবং দুনিয়া হারানোকে পাত্তা না দেয়া। কেননা তারাই পার্থিব জীবনের হীনতা, মূল্যহীনতা ও তাচ্ছিল্যতা, দ্রুত হাতবদল হওয়া, ফেতনা ইত্যাদি সম্পর্কে বেশি অবগত।

পাঁচ. সর্বদা নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের পন্থায় দুনিয়া উপার্জন থেকে বিরত থাকা:

লোভ-লালসা ও সন্দেহের স্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হবে। এমন কিছু করা যাবে না যাতে নিজের ব্যক্তিত্ব খর্ব ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যদিও তা বাহ্যিকভাবে জায়েযই হোক না কেন। কেননা নিজেকে অপবাদের জায়গা থেকে দূরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে সাধারণ মানুষ অহেতুক সন্দেহে পতিত না হয়। আর কোনো বৈধ কারণে যদি এধরনের কিছুতে অংশগ্রহণ করতেই হয় তবে যে তা প্রত্যক্ষ করেছে তাকে সেই কাজের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা। যাতে সে খারাপ ধারণা পোষণ করে গুনাহগার না হয় কিংবা তার ব্যাপারে সন্দেহ করে উপকৃত হওয়ার ধারা ছিন্ন না করে। এ কারণেই একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে কথা বলা অবস্থায় দু’জন লোক দেখতে পেলে তিনি তাদেরকে দাঁড় করালেন এবং বললেন, এ হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়্যা! এর কারণও বর্ণনা করলেন তিনি। তা হচ্ছে শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে ধোঁকা দেয় এবং অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে। হাদীছটি নিম্নরূপ:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، فَقَالَا:

سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا»، أَوْ قَالَ: «شَيْئًا»

সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফে ছিলেন, আমি রাতে তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসি। আমি তার সাথে কথা বলি, অতঃপর রওয়ানা দেই ও ঘুরে দাঁড়াই, তিনি আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তার ঘর ছিল উসামা ইব্‌ন যায়েদের বাড়িতে। ইত্যবসরে দু'জন আনসার অতিক্রম করল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে দ্রুত চলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন: থাম, এ হচ্ছে সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই। তারা আশ্চর্য হল: সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহ রাসূল! তিনি বললেন: নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় বিচরণ করে, আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।' [বুখারী: ৩২৮১; মুসলিম: ২১৭৫]

ছয়. ইসলামী শিআর-নিদর্শন ও বাহ্যিক বিধানাবলি পালনে যত্নবান হওয়া:

যেমন, মসজিদে জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করা, আম-খাস সকলের মধ্যে সালামের প্রচলন ঘটানো, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান। আর এগুলো করতে গিয়ে প্রভাবশালীদের কষ্ট সহ্য করা এবং এতে আল্লাহ তা'আলার জন্য নিজেকে তুচ্ছ

জ্ঞান করা। কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনায় কান না দেয়া। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর কথা সদা অন্তরে জাগরুক রাখা। যথা-

﴿ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧ ﴾ [لقمان: ١٧]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীর কষ্টের কথাও মনে করে ইলম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বাধা ও কষ্টের বিষয়টি মেনে নেয়া। সুন্নাত প্রতিষ্ঠা এবং বিদআত নির্মূলে সচেষ্ট হওয়া। দীনের যাবতীয় বিধান ও আদর্শ প্রতিষ্ঠাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থীর করা। বিশুদ্ধপন্থায় মুসলিমের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে শুধু স্বাভাবিক বৈধ কাজেই সন্তুষ্ট না হয়ে সর্বোচ্চ সুন্দর ও ভালো কাজে অভ্যস্ত হওয়া। কেননা ওলামায়ে কেরাম হলেন মানুষের লক্ষ্যস্থল ও আদর্শগ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু। তারাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য দলিল স্বরূপ। তাই যারা জানে না তারা তাদেরকে দেখে অনুস্বরণ করবে, আমল করবে। সুতরাং স্বয়ং আলেমই যদি নিজ ইলম অনুযায়ী আমল না করেন তবে অন্যদের আমল করা তো আরো পরের কথা। এ কারণেই আলেমের পদস্খলনকে অন্য যে কোনো ব্যক্তির পদস্খলনের চেয়ে অনেক ভয়াবহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা তাদের অনুসরণ করে অন্যদেরও পদস্খলন ঘটার ভয় থাকে।

সাত. নফল ও মুস্তাহাব যাবতীয় ভালো কাজ পালনে যত্নবান হওয়া:

শরীয়তপ্রণেতা তথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও আদর্শ বুলন্দের জন্য প্রাণপণ মেহনত করা। তাই কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার, দিনরাতের বিভিন্ন দু‘আ, বিভিন্ন কাজের শুরু-শেষের দু‘আ, নফল সালাত ও রোজা, হজ-ওমরা পালন করা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। আর সাধারণ মানুষের মতো কুরআন তিলাওয়াত না করা। বরং তিলাওয়াতের সময় কুরআনের আদেশ-নিষেধ, হেকমত-প্রজ্ঞা, সুসংবাদ-আজাবের ভয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা। এমনিভাবে কুরআন হিফজ করার পর তা ভুলে যাওয়ার শাস্তির কথাও স্মরণে রাখা। সহজে কুরআন ইয়াদ রাখার পন্থা হচ্ছে অন্তত সাতদিনে একবার মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করা।

আট. সামাজিক আচার-আচরণে দায়িত্ব ও করণীয়

মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। তাদেরকে খানা খাওয়ানো। সাধারণ লোকদের কেউ মূর্খতাবশত ভুল-ভ্রান্তি করে থাকলে ক্ষমা করে দেয়া। মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা। কেউ উপকার করলে তার শোকর আদায় করা। এই গুণটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে এর নিদারুণ অভাব। এটা চরম অসৌজন্যতাও বটে। পশ্চিমা দেশগুলো ইসলাম না মানলেও পরোক্ষভাবে ইসলামের আদর্শগুলো খুব ভালো করে অনুসরণ করে। তাদের মধ্যে সৌজন্যতাবোধের ঘাটতি নেই। আপনি সামান্য উপকার করলেও তারা আপনার প্রতি অসামান্য কৃতজ্ঞ দেখাবে। অথচ গুণটি থাকা দরকার ছিল আমাদের মধ্যে,

বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে। তাই এবিষয়ে সচেতন হওয়া চাই। অভাবীর হাজত পূরণে সচেষ্ট হওয়া। প্রতিবেশি ও নিকটাত্মীয়দের হক আদায় করা। এদের কাউকে সালাত তরক কিংবা পাপকাজে লিপ্ত হতে দেখলে হেকমত ও নম্রতার সঙ্গে শোধরানোর চেষ্টা করা। সৎকাজে আদেশ ও পাপকাজে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা হেকমত অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মসজিদে পেশাব করা সেই বেদুইনের সঙ্গে নম্রতা অবলম্বনের ঘটনা দ্বারা শিক্ষা নিতে পারি।

নয়. ধোঁকা-প্রতারণা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাঁচা

বিরোধীতা-বিদ্রোহ, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হওয়া, অহংকার-লৌকিকতা, আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, লোভ-লালসা, গর্ব-দাম্ভিকতা, দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাগতিক বিষয়ে অহংকার প্রদর্শন, আত্মপ্রশংসা কামনা করা, আত্মচিন্তা, আত্মস্বার্থ, মানুষের দোষ তালাশের পেছনে লেগে থাকা, নিজের দোষ সংশোধনের চেষ্টা না করা, বংশীয় ও গোত্রীয় গোঁড়ামী, গিবত-চোগলখোরি, মিথ্যাচার, মিথ্যা অপবাদ প্রদান, কাজে ও কথায় অশ্লীলতা, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় নিম্নমানের ও নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা এবং সুন্দর ও পবিত্র স্বভাব দ্বারা নিজেকে ঋদ্ধ করা। বিশেষভাবে নিকৃষ্ট আখলাক থেকে নিজেকে বাঁচানো। কেননা এটাই যাবতীয় অকল্যাণের মূল। বিশেষ

করে হিংসা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, লৌকিকতা এবং মানুষকে তাচ্ছিল্য করা- এই চারটি মারাত্মক বদস্বভাব থেকে দূরে থাকা। আর এগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হচ্ছে; হিংসা থেকে বাঁচার জন্য এই চিন্তা করা যে, এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার হেকমতের বিরুদ্ধে অভিযোগ। তাছাড়া এতে নিছক আমারই কষ্ট, অন্তরকে খামোখা এই কাজে ব্যাপৃত রাখা ইত্যাদি। عجب النفس বা আত্মম্ভরিতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হচ্ছে এই চিন্তা করা যে; ইলম ও প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও হিকমত, মেধা ও সাহিত্যজ্ঞান ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার দান। তিনি যখন তখন এসব নেয়ামত ফিরিয়ে নিতে পারেন। وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ 'আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়।'

তাই এ নিয়ে আত্মতুষ্টির কিছু নেই। লৌকিকতার ব্যধি দূর করার জন্য এই ফিকির করা যে, কোনো মাখলুক কারো কোনো উপকার করতে পারে না। ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব নিজের আমল কাউকে দেখানোতে লাভও নেই ক্ষতিও নেই। প্রতিদান পেতে হলে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকেই পেতে হবে। তিনি অন্তর্যামী। অতএব নিয়তের এই খারাবীর কারণে আমলের প্রতিদান বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ»

‘আবূ বাকরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি শোনানোর জন্য আমল করে তার আমলের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তা‘আলা কেয়ামত দিবসে অন্যদেরকে শুনিয়ে দেবেন যে, এই লোকটি শুধু মানুষকে শোনানোর এবং দেখানোর জন্যই আমল করত। (এভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে কেয়ামতবাসীর সামনে লাঞ্ছিত করবেন)। এবং যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য আমল করবে তার সঙ্গেও অনুরূপ আচরণই করা হবে।’ [বুখারী: ৬৪৯৯; মুসলিম: ২৯৮৬]

আর মানুষকে তাচ্ছিল্য করার ব্যাধি দূর করতে অন্তরে সর্বদা এই আয়াত হাজির রাখা। যথা-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ ﴾ [الحجرات: ١١]

‘কোনো লোক যেন অন্য লোককে বিদ্রুপ না করে। হতে পারে যাকে বিদ্রুপ করা হয় সে বিদ্রুপকারীর চেয়ে উত্তম।’ {সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১১}

উত্তম-অনুত্তমের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। অতএব বাহ্যিক সাফল্য-ব্যর্থতার ভিত্তিতে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কোনো সুযোগ নেই। কুরআন বলে-

﴿ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ﴾ [الحجرات: ١٣]

‘তোমাদের সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তা‘আলার নিকট বেশি সম্মানী, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।’ {সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩}

অন্য আয়াতে নিজের শূচিতা দাবির নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যথা-

﴿ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢ ﴾ [النجم: ٣٢]

‘সুতরাং তোমরা নিজেদের আত্মার পবিত্রতার দাবি করো না। কারণ তিনিই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে বেশি মুত্তাকি।’ {সূরা আল-নাজম, আয়াত: ৩২]

সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবা যে, না জানি যাকে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে সে আমার চেয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট কত বেশি উত্তম। অতএব অধম হয়ে উত্তমকে তাচ্ছিল্য করা যায় না।

إن اللّٰه تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة وليه في عباده، ورضاه في طاعته، وغضبه في معصيته

‘আল্লাহ তা‘আলা তিনটি বস্তুকে তিনটি বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। যথা- নৈকট্য ইবাদতের মধ্যে, সন্তুষ্টি আনুগত্যের মধ্যে এবং ক্রোধ নাফরমানীর মধ্যে।’

মনে রাখতে হবে, আজ দুনিয়ায় নিজেকে অন্যের চেয়ে উচ্চতায় ভাবার পরিণাম কেয়ামত দিবসে ভয়াবহ রকমের বিপদের কারণ হতে পারে। যাদেরকে আজ আমি তুচ্ছ ভাবছি, কেয়ামত দিবসে আমার ঠিকানা হতে পারে তাদের পায়ের নিচে। এবিষয়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করি।

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَقْدَمَكَ قَالَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِيَ كَانَتْ بِحِذَائِي وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ فَقَالَ عُمَرُ تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ وَعَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنْ الْقَصَصِ فَإِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ فَقَالَ مَا شِئْتَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ

‘একবার হারেছ ইবন মুআবিয়া কিন্দি উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট মদিনায় আগমন করলেন তিনটি বিষয় জানার জন্য। ...(হাদীছের দীর্ঘ বর্ণনার পর) আরেকটি হলো, কিস্সা বর্ণনা সম্পর্কে। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এই কাজের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে বললেন, ‘তুমি যা চাও।’ হারেছ কিন্দি বললেন, আমি আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য শুনতে চাই। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমার ভয় হয় তুমি মানুষের মধ্যে কিসসা বর্ণনা করে কোনো পর্যায়ে গিয়ে নিজেকে তাদের চেয়ে উচ্চ ভাবতে শুরু করবে। মনে করবে তাদের তুলনায় তোমার স্থান ছুরাইয়া তারকার মতো উঁচুতে। ফলে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে তোমার ধারণার পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পায়ের নিচে স্থান দেবেন।’ [মুসনাদ আহমাদ: ১১১]

সুতরাং আমাদের নিয়তের স্বচ্ছতা, পবিত্রতা ও শুদ্ধতা থাকা দরকার। বিশেষ করে অন্যকে ছোটো ও তাচ্ছিল্য করার হীনপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচা একান্ত কর্তব্য।

উত্তম আখলাকের আরেকটি আলামত হচ্ছে, সার্বক্ষণিক তাওবার আমল জারি রাখা, ইখলাসের সঙ্গে আমল করা, ইয়াকিন মজবুত করা, তাকওয়া-পরহেজোগারী, সবর-ধৈর্য, অল্পেতুষ্টি, যুহদ-দুনিয়াবিমুখতা, তাওয়াক্কুল, আত্মসমর্পণ, অভ্যন্তরীণ নিষ্কলুষতা, ক্ষমা-উদারতা, সদ্ব্যবহার, ইহসান-শোকর, মাখলুকের প্রতি সদয় হওয়া, আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের প্রতি লজ্জাশীলতা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত পোষণ করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই শেষোক্ত গুণ হচ্ছে সমস্ত ভালোগুণের আধার এবং তা হাসিল হয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের মধ্য দিয়ে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। যেমন-

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣١ ﴾ [آل عمران: ٣١]

'আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩}১

দশ. নিজেকে সর্বদা মুজাহাদা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা:

কেরাত, মুতালা‘আ, যিকির-ফিকির, সংকলন, লেখালেখি ইত্যাদি নেককাজে কাজে ব্যাপৃত থাকা। খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা, প্রয়োজনীয় ঘুম-বিশ্রাম, পারিবারিক হক আদায়, জীবিকা উপার্জন এবং সাংসারিক অতি জরুরী কাজ ছাড়া জীবনের মূল্যবান সময় ইলম-আমল ছাড়া অন্য কাজে ব্যয়িত না করা। এসব কাজ ছাড়া মুমিনের অবশিষ্ট জীবনের কোনো মূল্য নেই। যার ভালোমন্দ উভয় দিন সমান সে তো প্রতারিত। ইলম হাসিল করতে গিয়ে সামান্য রোগ-ব্যাধিকে প্রশ্রয় না দেয়া। আমাদের সলফে সালেহীন রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতেন ইলমে দীন হাসিল করার মাধ্যমে। কেননা ইলমের দরজা হচ্ছে মিরাছে আম্বিয়া। আর এই মর্যাদা সামান্য রোগ-শোক বরদাশত ও কষ্ট-মেহনত ছাড়া হাসিল হয় না। ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছির (রহ.) বলতেন,

لا يستطاع العلم براحة الجسم

‘শারীরিক সুখ বজায় রেখে ইলম হাসিল করা যায় না।’

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

‘আনাছ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাত সাজানো হয়েছে কষ্টকর বস্তুর আবরণ দিয়ে। আর জাহান্নাম সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তি দ্বারা।’ [মুসলিম: ২৮২২; বুখারী: ৬৪৮৭]

অর্থাৎ আমলের কষ্ট মাড়াতে পারলেই কেবল জান্নাতের বাধা ডিঙানো যাবে।

কবি বলেন,

تريدين إدراك المعالي رخيصة ... و لا بد دون الشهد من إبر النحل

‘তুমি স্বল্পমূলে উচ্চমর্যাদা হাসিল করতে চাও? মনে রেখো, মধুমক্ষিকার হুল খাওয়া ছাড়া মধু হাসিল হয় না।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সম্পর্কে রবী (রহ.) বলেন,

لم أر الشافعي آكلاً بنهار ولا نائماً بليل لاشتغاله بالتصنيف،

‘আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-কে দিনে খানা খেতে এবং রাতে ঘুমাতে দেখিনি। কেননা সর্বদা মুতালাআ‘ জ্ঞানসাধনা এবং সংকলন ও লেখালেখিতেই ব্যস্ত থাকতেন তিনি।’

এগার. ইলম হাসিলে লজ্জাবোধ না থাকা:

যে বিষয়ের ইলম নেই তা হাসিল করার ব্যাপারে কোনোরুপ লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। এমনকি যদি বয়স, পেশা, মর্যাদা, সম্মান ও সবদিক দিয়ে নিজের চেয়ে কম অবস্থানের লোকের কাছ থেকেও

তা হাসিল করতে হয় তাতেও লজ্জাবোধ করতে নেই। বরং ইলম ও হিকমত হাসিলের ব্যাপারে সর্বদা এই হাদীছের কথা স্মরণে রাখা চাই-

الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها

'ইলম ও হিকমত হচ্ছে মুমিনের হারানো সম্পদ।' সুতরাং তা যেখানেই পাওয়া যাবে মুমিন সেখান থেকেই যেন তা সংগ্রহ করে।

কোনো ব্যক্তি কি নিজের হারানো মূল্যবান সম্পদ রিক্সাওয়ালা বা কুলি-মজদুর পেয়ে থাকলে তার কাছ থেকে তা ছাড়িয়ে নিতে লজ্জাবোধ করে? তবে এরচেয়ে হাজারগুণ মূল্যবান সম্পদ ইলম হাসিল করতে ব্যক্তি বিশেষের দোহাই দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করার অর্থ কী?

মনে রাখতে হবে চেষ্টা ও মুজাহাদা ছাড়া কোনো কিছুই অর্জিত হয় না। এ সম্পর্কে একটি হাদীছ উল্লেখ করা যেতে পারে:

عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: إن داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَا رَبِ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: يَا دَاوُد ، إنَّ إبْرَاهِيمَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ فِي سبي فَصَبَرَ فِيَّ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة دمه في سبي فَصَبَرَ ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذَتُ حَبِيبُهُ حَتَّى ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك

‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একবার নবী দাউদ (আ.) আল্লাহ তা‘আলার কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈলের লোকেরা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের নামের উসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করে। আমাকে আপনি তাদের চতুর্থজন বানিয়ে দিন। জবাবে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করলেন, হে দাউদ! নবী ইবরাহীম আমার জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো, অথচ তুমি সেই কষ্ট-মুজাহাদার সম্মুখীন হওনি। নবী ইসহাক আমার কারণে নিজের দেহের রক্ত প্রবাহিত করেছিল অতপর আমার রেজামন্দির জন্য ছবর করেছিল। অথচ তুমি সেরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওনি। আর ইয়াকুবের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু (তথা সন্তান) ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল আর সে তার অপেক্ষায় দুই চোখ সাদা করা সত্ত্বেও আমার জন্য সবর করেছিল। অথচ তুমি সেই কষ্ট-মুজাহাদা করো নি।’ [মুসান্নাফ ইবন আবি শায়বা: ৩৫৪০৩]

আলোচ্য হাদীছে একথার শিক্ষা পাই যে, কষ্ট-মুজাহাদা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া উঁচু মাকাম হাসিল করা যায় না। সাঈদ ইবন জুবায়ের (রহ.) বলেন,

لا يزال الرجل عالماً ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون

‘একজন ব্যক্তি কখনই আলেম হতে পারবে না, যদি না সে অবিরাম ইলম হাসিল করতে থাকে। আর যখন সে ইলম অন্বেষণ ছেড়ে দেবে এবং একথা ভাববে যে, সে যথেষ্ট পরিমাণ ইলম শিখে

ফেলেছে এবং তার কাছে যা আছে তা তার জন্য যথেষ্ট, তবে সে যা শিখেছে তার চেয়ে বেশি অজ্ঞ ও জাহেল।’

জনৈক কবি বলেন,

وليس العمى طول السؤال وإنما ... تمام العمى طول السكوت على الجهل

‘বারবার প্রশ্ন করা মূর্খতার আলামত নয়। বরং মূর্খতার আলামত হচ্ছে না জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন না করা।’

আমাদের পূর্বসূরীগণ না জানা বিষয় স্বীয় ছাত্রদের কাছ থেকে শিখতেও লজ্জাবোধ করতেন না। শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্র হুমায়দী (রহ.) বলেন,

صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث

‘আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে মিসর পর্যন্ত সফর করেছি। সফরের পুরো সময় আমি তার কাছ থেকে শিখতাম বিভিন্ন মাসআলা। আর তিনি আমার কাছে শিখতেন হাদীছ।’

সাহাবাগণ তাবেঈগণ থেকে ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করতেন না। আর এরচেয়ে বড় দলিল কী হতে পারে যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শাগরেদ উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন?

বারো. যোগ্যতার ভিত্তিতে লেখালেখির মাধ্যমে ইলমের প্রসার ঘটানো:

ইলমচর্চার ধারাবাহিকতা সাদাকায়ে জারিয়ায় পরিণত করতে যোগ্যতার শর্তে সংকলন ও তাসনীফ-তালীফের কাজ করা উচিত। সংকলন ও তাসনীফ-তালীফের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন,

يثبت الحفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويجيد البيان، ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر، ويخلده إلى الابد

'(লেখিলেখি) এর দ্বারা হেফজ শক্তিশালী, অন্তর ধারালো, তবিয়ত সুচারু এবং বর্ণনা তীক্ষ্ণ হয়। যুগ যুগ ধরে প্রশংসা জারি থাকে এবং ছাওয়াব হাসিল হয় এবং এটা তাকে শেষদিন পর্যন্ত অমর করে রাখে।' যেমন বলা হয়-

يموَت قوَم فيحيي العلم ذكرهم ... و الجهل يلحق أمواتاً بأموات

'জাতি মরে যায় কিন্তু ইলম তাদের স্মরণ জীবিত রাখে। আর জাহেলরা মরার পর মৃতদের সঙ্গে মিলিত হয়।'

আরেকজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন,

علم الإنسان ولده المخلد

'মানুষের ইলম হচ্ছে তার অমর সন্তান।'

আবূল ফাতহ আলী ইবন মুহাম্মাদ আলবুস্তী বলেন,

يقولون ذكر المرء يبقى بنسله ... و ليس له ذكر إذا لم يكن نسل

فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي ... فمن سره نسل فإنا بذا نسلو

‘মানুষ বলে, বংশ দ্বারা মানুষ স্মরণীয় হয়, এর দ্বারা তার নাম বাকি থাকে। তাই যদি বংশ না থাকে তবে কেউ তাকে স্মরণ করে না। আমি তাদেরকে বলব, আমার বংশ হচ্ছে আমার ইলম ও হেকমতের দুষ্প্রাপ্যতা। সুতরাং কেউ যদি স্মরণকারী বংশ চায় তবে সে যেন এই পথই বেছে নেয়।’

আর সংকলনের ক্ষেত্রে মানুষের হাতে নেই এমন বিষয় বেছে নেওয়া কিংবা পুরান বিষয় হলে তাতে নতুনত্ব আনতে আলোচনার আঙ্গিক পরিবর্তন করে সংকলনের কাজ সম্পন্ন করা প্রশংসনীয়। সংকলনের ক্ষেত্রে অতি বিস্তারিত আলোচনা কিংবা বুঝতে অক্ষম সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উভয়টি পরিহার করা উচিত। বারবার পাঠ ও অসংখ্যবার নজর দেওয়া ছাড়া পাণ্ডুলিপি না ছাড়া। সংশোধন ও পরিমার্জন করার পরই কেবল পাণ্ডুলিপি ছাড়া। তবে যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া এসব কাজে হাত না দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এটা নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট এবং পাঠককে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় পর্ব: দরস বিষয়ে উস্তাদের করণীয়

এক. দরসের মজলিসে বসার পূর্বে সকল প্রকার নাপাকি থেকে দেহ ও কাপড় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা এবং সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করা। কাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে যমানার নেককার লোকদের অনুসরণ করা, যাতে ইলম ও শরীয়তের মর্যাদা বুলন্দ হয়। ইমাম মালেক (রহ.) হাদীছের দরসে বসার আগে গোসল করতেন, সুগন্ধি

ব্যবহার করতেন, নতুন কাপড় পরিধান করতেন এবং মাথার ওপর চাদর ঝুলিয়ে দিতেন। অতপর দরসের মসনদে উপবেশন করতেন। আর দরস শেষ না হওয়া পর্যন্ত মজলিসে সুগন্ধিযুক্ত কাঠি জ্বালিয়ে রাখতেন। তিনি বলতেন,

أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

'আমি এভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ভালোবাসি।'

বস্তুত সাধ্য থাকা অবস্থায় কাপড়-চোপড়ে শান-শওকত অবলম্বন করা মন্দ বা নিন্দনীয় নয়। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها ... زين الرجال بها تعز وتكرم

دع التواضع في الثياب تحرياً ... فالله يعلم ما تجن وتكتم

فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة ... عند الإله وأنت عبد مجرم

و بهاء ثوبك لا يضرك بعد أن ... تخشى الإله وتتقي ما يحرم

'কাপড় নতুন ও পরিচ্ছন্ন রাখো। কেননা তা পুরুষের সৌন্দর্য এবং এর দ্বারা তুমি সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। কাপড়ের ক্ষেত্রে বিনয় পরিহার করো। কেননা তুমি মনে যা গোপন করো আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র তোমাকে রবের নিকটবর্তী করে না; যদি তুমি অপরাধী হও। পক্ষান্তরে বস্ত্রের চাকচিক্য তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, যদি তুমি প্রভুকে ভয় করো।'

দরসে যাওয়ার আগে দুই রাকাত ইস্তেখারা সালাত আদায় করা উচিত (যদি মাকরূহ সময় না হয়)। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির দিনে অন্তত একবার এই সালাত আদায় করা দরকার। জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের সব কাজ শুরু করার আগে استقسام بالأزلام তথা ভাগ্য গণনার শর দ্বারা শুরু করত। ইসলাম এর বিরুদ্ধে এমন এক পন্থা বাতলে দিয়েছে যাতে তাওহীদ ও একত্ববাদ, আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও নিজের সবকিছু তার ওপর হাওয়ালা করার অনুশীলনী রয়েছে। অতপর নশরে ইলম, তাবলীগে দীন, শরঈ বিধানের প্রচার-প্রসার, রবের হুকুম-আহকাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ইলম বৃদ্ধির নিয়তে দরসে গমন করবেন। দরস শুরু করার আগে সলফে সালেহীনের জন্য দু'আ করবেন। দরসের উদ্দেশ্যে কক্ষ থেকে বের হওয়ার আগে এই দু'আ পাঠ করা উচিত-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

সেই সঙ্গে নিম্নোক্ত দু'আটিও পাঠ করা চাই-

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله

দরসের মজলিসে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির জারি রাখা উচিত। মজলিসে পৌঁছার পর সর্বপ্রথম উপস্থিত সকলকে সালাম প্রদান করা চাই। অতপর আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওফীক ও সাহায্য কামনা করে উস্তাদ দরস শুরু করবেন। চেষ্টা করবেন

কেবলামুখী হয়ে দরসের মজলিসে উপবেশন করতে। কেননা হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَكْرَمُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ

'ওই মজলিস সর্বোত্তম যা কিবলামুখি হয়।' [মু'জামুল আওসাত: ৮৩৬১]

অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা, গাম্ভীর্যতার সঙ্গে চারজানু অথবা মাকরূহ নয় এমন যে কোনো পন্থায় উপবেশন করবেন। কিন্তু এক পা উঠিয়ে, পা ছড়িয়ে দিয়ে, ডানদিক কিংবা বামদিক অথবা পেছনের দিকে কোনো বস্তুর সঙ্গে হেলান দিয়ে উপবেশন করা উচিত নয়। দরসের মজলিসে অহেতুক হাসি-মশকরা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কেননা এর দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য হ্রাস পায়। যেমন বলা হয়-

من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به

'যে অহেতুক হাসি-মশকরা করে সে এর দ্বারা হালকা হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি যে কাজ বেশি করে সে সেই কাজ দ্বারা পরিচিত হয়।'

ক্ষুধা, পিপাসা, দুশ্চিন্তা, রাগ-ক্রোধ, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা কিংবা অতিরিক্ত গরমের সময় এবং মানসিক পেরেশানির অবস্থায় দরস দেওয়া উচিত না। কেননা এসব পরিস্থিতিতে দরস দিলে অনেক সময় ভুল উত্তর কিংবা ভুল ফাতাওয়া দেয়ার আশঙ্কা থাকে।

তিন. মজলিসে একটু উঁচু স্থানে উপবেশন করা বাঞ্ছনীয়। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ইলম ও বয়সের দিক দিয়ে জৈষ্ঠকে বিশেষ সম্মান করা কাম্য। আর অবশিষ্টদের সঙ্গেও কোমল ব্যবহার করা চাই। দরসে শরীক সকলকে সালামের মাধ্যমে সম্মান জানানো, হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথাবার্তা বলা শোভনীয়। উপস্থিত ছাত্রদের প্রতি প্রয়োজনের সময় পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে তাকানো এবং বক্রভাবে না তাকানো। কেউ যে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে কিংবা দরস বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তার সঙ্গে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে কথা বলা এবং উত্তর প্রদান করা একজন আদর্শ উস্তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রশ্নকর্তাকে দুর্বল ভেবে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা অহংকারের লক্ষণ। এটা উস্তাদের জন্য কখনই মানানসই নয়।

চার. যে কোনো বিষয়ের দরস শুরু করার আগে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে নেওয়া উত্তম। কেরাত পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর নিজের জন্য, ছাত্রদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য দু'আ করা যেতে পারে। অতপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পাঠ এবং হামদ-ছানা ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করবেন। এরপর সম্ভব হলে ইমাম, মুজতাহিদ, স্বীয় উস্তাদ-মাশায়েখে কেরাম ও মা-বাবার জন্য বিশেষ দু'আ করে তারপর দরস শুরু করবেন।

পাঁচ. একাধিক দরসের বিষয় হলে মর্যাদার দিক বিবেচনা করে একটিকে আরেকটির আগে রাখা উচিত। সুতরাং প্রথমে তাফসীরুল কুরআন, তারপর হাদীছ, এরপর উসুলে দীন, উসূলে ফিকহ, অতপর

ইখতেলাফী বিষয়, নাহব-সরফ ইত্যাদি পাঠদানের ব্যবস্থা করা উচিত। দরসে যেখানে বিরতি দেওয়ার সেখানে বিরতি দেওয়া এবং যেখানে সবক চালিয়ে নেওয়া দরকার সেখানে চালিয়ে নেওয়া ভালো। দীনের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে এমন কিছু দরসে উপস্থাপন করলে তার জবাব দিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। হয়ত ওই বিষয় ও তার জবাব একসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে নতুবা কোনোটাই উল্লেখ করা যাবে না। আর দরস বিরক্তিকর দীর্ঘ কিংবা বুঝতে অক্ষম সংক্ষিপ্ত করাও অনুচিত। এসব ক্ষেত্রে ছাত্রদের গ্রহণ ক্ষমতার কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

ছয়. দরসে প্রয়োজনের চেয়ে উচ্চস্বরে কথা বলা শোভনীয় নয়। আবার বেশি নিচু স্বরেও হওয়া অনুচিত। পাশে অন্য দরস চললে তাদের যেন সমস্যা না হয় সেটা উস্তাদ-ছাত্র সবাইকে নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা নিম্নস্বর পছন্দ এবং উচ্চস্বর অপছন্দ করতেন। বর্ণিত হয়েছে-

إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع

‘আল্লাহ তা‘আলা নিম্নস্বর পছন্দ এবং উচ্চস্বর অপছন্দ করেন।’ [মুসনাদে উমর]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল এমনভাবে কথা বলা যাতে শ্রোতারা তা উপলব্ধি করতে পারে এবং তিনি কথা শেষ করে কিছুটা বিরতি দিতেন, যাতে কেউ কোনো বিষয়ে না বুঝলে জিজ্ঞেস করতে পারে। আর ছাত্রদের উচিত, উস্তাদের কথা

শেষ করতে দেওয়া এবং কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হলে তিনি নিজ থেকে কথা থামালে তখন জিজ্ঞেস করা। অন্যথায় আলোচনার বিষয় বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-কে দরসে মধ্যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন,

نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد

‘আগে আমার কথা শেষ করি তারপর তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাবে।’

দরসে উপস্থিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হক বস্তু জানা। অতএব হক জাহির হয়ে যাওয়ার পর তা সহজে মেনে নিতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা অনেক সময় তা ঝগড়া ও মনমালিন্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই মজমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের মাধ্যম বলে মনে করতে হবে। আর স্মরণে থাকবে আল্লাহ তা‘আলার বাণী-

﴿ لِيُحِقَّ ٱلۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ ٱلۡبَٰطِلَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٨ ﴾ [الانفال: ٨]

‘যাতে তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণিত করেন এবং বাতিলকে বাতিল করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৮}

অর্থাৎ হক সাব্যস্ত ও বাতিল প্রকাশিত করার নিয়তে দরস প্রদান ও গ্রহাণ করা।

আট. দরসে কেউ শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ করলে কিংবা হাসি-তামাশা, অন্যের সঙ্গে কথা বলে, অমনোযোগী হয়, বিনা প্রয়োজনে উচ্চবাচ্য করে, সঙ্গীদের কাউকে বিদ্রুপ করে, হক জাহির হয়ে যাওয়ার পরও তা মানতে সংকোচ করে কিংবা দরসের জন্য অশোভনীয় কোনো কাজ করে তবে তাকে শাসানো উস্তাদের একান্ত দায়িত্ব। অবশ্য এরজন্য হেকমত অবলম্বন করা এবং এমন কোনো পন্থা গ্রহণ করা যাতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।

নয়. দরসের আলোচনায় ইনসাফের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। প্রশ্নকর্তার জ্ঞানের পরিধি বিবেচনা করে তার উত্তর দিতে হবে। বুঝতে অক্ষম এমন তাফসিলী জবাব প্রদান করা ঠিক নয়। নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার আকল অনুযায়ী আচরণ করা। আর কোনো ছাত্র যদি নিজের না জানা বিষয়ে প্রশ্ন করে তবে নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া- لا أعلم 'আমি জানি না।'

বস্তুত এটা আদৌ দোষের কিছু নয়। বরং সৎসাহস ও ইলমী আমানত রক্ষার আলামত। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم.

'হে লোক সকল! যে ব্যক্তি জানে কেবল সেই যেন কথা বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে, 'আল্লাহই ভালো জানেন'। কেননা না জানা বিষয়ে 'আল্লাহই ভালো জানেন' বলাও ইলমেরই এক অংশ।'

জনৈক পূর্বসূরী মনীষী বলেছেন-

لا أدري نصف العلم.

'আমি জানি না বলতে পারা ইলমের অর্ধেক।'

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله

'যে আলেম 'আমি জানি না' কথাটি বলতে ভুলে যায় তার কথা ভুলে পতিত হয়।'

শুধু নিজেই নয়, শিক্ষার্থীদেরকেও এ কথাটির প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর মনে রাখতে হবে যে, 'আমি জানি না' কথাটি বললে সম্মান কমে না বরং বাড়ে। কেননা হাজার হাজার মাসআলা থেকে দুয়েকটি জানার বাইরে থাকা আদৌ দোষের বিষয় নয়। তাই এ কথাটি তার আমানতদারী, সততা, বিশ্বস্ততা, মানসিক স্বচ্ছতা এবং রবকে ভয় করার আলামত।

সালফে সালেহীন বলেন, কথাটি বলতে কেবল তারাই সংকোচ ও লজ্জাবোধ করে, যাদের দীনদারী দুর্বল এবং আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথভাবে ভয় করে না। কেননা, জানি না বলে মানুষের চোখ থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে আল্লাহ তা'আলার চোখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও না জানা সত্ত্বেও তা বলার কারণে পরে ভুল ধরা পড়ে। ফলে মানুষের চোখে বড় হওয়ার নিয়তে বলতে গিয়ে উল্টো তাদের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যায়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই

ওলামায়ে কেরামকে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। খিজির (আ.) ও মূসা (আ.)-এর ঘটনা এর প্রমাণ।

দশ. দূর থেকে আগত তালেবে ইলমের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা চাই। তাদের প্রতি অধিক স্নেহসুলভ আচরণ করা দরকার। যাতে তার একাকীত্ব ঘুচে যায়। আর তার দিকে বারবার অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাকানো কাম্য নয়। কারণ এতে তার মানসিক অবস্থা ভেঙে যায়।

এগার. দরস শেষে والله أعلم কথা বলার প্রচলন আছে। তবে উত্তম হলো দরস শেষ করার আগে এমন কোনো কথা বলা যা দরস শেষ হওয়ার আলামত বলে অনুভূত হয়। দরস শেষ হওয়া মাত্রই উস্তাদ মজলিস থেকে উঠবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। এতে বিশেষ ফায়েদা রয়েছে। যেমন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সে ওই সময়ে তা জিজ্ঞেস করতে পারবে। তাছাড়া ছাত্রদের ভীড়ে পড়ার মতো বিব্রতকর পরিস্থিতিতেও পড়তে হবে না। মজলিস শেষ করে দাঁড়ানোর মুস্তাহাব দু'আর কথা ভুলবেন না। যথা-

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

'তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।' [তিরমিযী: ৩৪৩৩]

বারো. যে বিষয়ে জানাশোনা নেই দরসে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই ঠিক নয়:

কেউ এ রকম কথা ওঠালে তা তড়িৎ থামিয়ে দেয়াই উত্তম। কেননা এটা দীন নিয়ে তামাশা করা এবং মানুষের মধ্যে নিজেকে বড় করে তোলার মিথ্যা প্রয়াস। এ ব্যাপারে হাদীছে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»

'যাকে যা দেওয়া হয়নি তার সেটার দাবিদার মিথ্যার পোশাক পরিধানকারীর ন্যায়।' [বুখারী: ৫২১৯; মুসলিম: ২১২৯]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন,

من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي

'যে সময় আসার আগেই নেতৃত্ব চায়, সে অবশিষ্ট জীবন লাঞ্ছনার মধ্যে কাটায়।'

এছাড়া এর দ্বারা শ্রোতারাও ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তারা ভুল জিনিসের জ্ঞান নিয়ে পরবর্তী জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হয়। আবূ হানীফা (রহ.)-কে বলা হলো-

في المسجد حلقة ينظرون في الفقه فقال الَهُمْ رأس؟ قالوا: لا قال لا يفقه هؤلاء أبداً

‘এক মজলিসে ফিকহের আলোচনা চলছে। তিনি বললেন, তাদের কোনো যিম্মাদার আছে কি? তারা জানালেন, না। তিনি বললেন, এরা কখনই ফিকহ হাসিল করতে পারবে না।’

তৃতীয় পর্ব:

ছাত্রদের সঙ্গে উস্তাদের আচার-আচরণ

এক. তালীম ও শিক্ষাদীক্ষা প্রদানকে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন, ইলমের প্রচার-প্রসার, ইয়াহইয়ে দীন, হক জাহির ও দায়েম রাখা, বাতিল ধ্বংস করা, আলেমের সংখ্যা বাড়িয়ে উম্মতের কল্যাণ বৃদ্ধি করা, এদের সর্বশেষ ব্যক্তি থেকেও সদকায়ে জারিয়ার একটি অংশ এবং তাদের পক্ষ থেকে রহমত প্রাপ্তির দু‘আ লাভ, তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ইলমের সিলসিলায় প্রবিষ্ট করা এবং দীনের বাহক ও ইলমে ওহীর ধারকের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নেক কাজের অংশ বলে মনে করা চাই। কেননা ইলমে দীন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া দীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দুই. তালেবে ইলমের ইখলাস নাই- এই অযুহাতে তাকে ইলম থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। কেননা তার নেক নিয়তের আশা সুদূরপরাহত নয়। অনেক সময় তালেবে ইলমের সহীহ সমঝ না থাকার কারণে প্রথমে নেক নিয়ত থাকে না কিন্তু বুঝ আসার পর নিয়ত ঠিক হয়ে যায়। পূর্বসূরীগণ বলতেন,

طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله،

‘প্রথমে গায়রুল্লাহর জন্য ইলম শিখতাম কিন্তু তা আল্লাহ তা‘আলার জন্য হওয়া বৈ অস্বীকার করেছে।’

কথাটির অর্থ হচ্ছে হয়ত প্রথম প্রথম নিয়ত সহীহ ছিল না বটে, কিন্তু পরবর্তীতে বুঝ আসার পর তা ঠিক হয়ে গেছে। আর উস্তাদের কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রদেরকে নিয়ত সহীহ করার জন্য তাগিদ দেয়া। তাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে প্রচেষ্টা চালানো যে, একমাত্র নেক নিয়তের দ্বারাই উচ্চমর্যাদা, ইলম-আমল ও হিকমত লাভ করা সম্ভব।

তিন. আল্লাহ তা‘আলা ওলামায়ে কেরামের মর্যাদার যে ঘোষণা দিয়েছেন ছাত্রদের অধিকহারে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাদের কুরআন, হাদীছ, শের-আশআর ও বিভিন্ন প্রবন্ধে ইলমের যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা ও জ্ঞান দেয়া। যাতে তারা হীনমন্যতায় না ভোগে।

চার. উস্তাদ নিজে যা পছন্দ করবেন ছাত্রদের জন্যও তাই পছন্দ করা উচিত। নিজের সন্তানকে যেভাবে মায়ামমতা প্রদান করা হয় তালেবে ইলমের প্রতিও সেই মায়ামমতা প্রদর্শন করা কর্তব্য। খুব সাধারণ ভাবেই কখনও কখনও তাদের দ্বারা ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পাবে। এরজন্য কখনও শাসনও করতে হবে আবার কখনও মাফও করে দিতে হবে। উস্তাদগণ একথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে, কঠোরতাই সংশোধনের একমাত্র পথ নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে আদেশ উপদেশের দ্বারা কঠোরতার চেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায়।

পাঁচ. দরস প্রদানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণ করা চাই। ছাত্রদেরকে নীতিমালা, কায়েদা-কানুন এবং সূক্ষ্ম ও উপকারী বিষয়াদি মুখস্ত করাতে উৎসাহিত করা খুবই জরুরী। আর অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন জ্ঞান- যা ছাত্রদের মস্তিষ্ককে বিচলিত করে- তা থেকে দূরে রাখা একান্ত বিচক্ষণতার লক্ষণ।

ছয়. মাসআলা ও আলোচনা বুঝানোর জন্য গ্রহণযোগ্য ও সরল উপস্থাপনা অবলম্বন একজন আদর্শ উস্তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হয় এ ধরনের আলোচনা করা যাবে না। উস্তাদ প্রথমে উদাহরণের সাহায্যে মাসআলাটি তুলে ধরবেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা ধারণক্ষমতা রাখে না তাদের জন্য শুধু মাসআলার কাঠামো ও উদাহরণ পেশ করেই ক্ষান্ত হবেন। আর যারা সামর্থ্য রাখে তাদের সামনে মাসআলার দলিলের উৎস, হেকমত, ইল্লত এবং অন্যান্য সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। মজলিসে যদি এমন কেউ উপস্থিত থাকে যার সামনে সরাসরি কোনো শব্দ উল্লেখ করা যায় না, তখন কোনো ইঙ্গিতবাহী শব্দ ব্যবহার করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন।

সাত. কোনো ব্যাখ্যামূলক দরস শেষ করার পর ছাত্রদের মেধা পরীক্ষার জন্য মাসআলা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় ছাত্রদের সামনে পেশ করা যেতে পারে। কেউ জবাব দিতে পারলে তার প্রশংসা করা বাঞ্ছনীয়। আর কেউ না পারলে তাকে হেকমতের সঙ্গে পুনরায় বুঝিয়ে দেবেন।

আট. মাঝেমধ্যে ছাত্রদের পূর্বের মুখস্ত করা বিষয় জানতে চাইবেন। পূর্বে উল্লিখিত জরুরীমাসায়েল, দুর্লভ বিষয়, কায়েদাকেন্দ্রিক শাখাগত মাসআলা ইত্যাদি উল্লেখ করে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেওয়া দরকার। যে ছাত্র জবাব দিতে পারবে অন্যের সামনে তার প্রশংসা করে তার হিম্মত ও অন্যের অনুপ্রেরণা বাড়াবেন। আর কেউ না পারলে অন্যের সামনে তাকে হেয় করবেন না। বরং উৎসাহিত করবেন।

নয়. কোনো ছাত্রকে তার সাধ্যের বাইরে চেষ্টা-মুজাহাদা করতে দেখলে সহজতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যাতে তিনি উম্মতকে তার সাধ্যের বাইরে কাজ করতে বারণ করেছেন। এক্ষেত্রে তার বাণীটি প্রবাদের মতো সর্বজনবিদিত হয়ে আছে। যথা-

« فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى»

'দিনরাত চলমান বাহন গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না এবং তার পৃষ্ঠদেশও ঠিক থাকে না।' [শু'আবুল ঈমান: ৩৮৮৬, যঈফ]

অন্য হাদীছে ইরশাদ করেন-

اكفلوا من العمل ما تطيقون

'যতটুকু সাধ্য আছে ততটুকু আমলের বোঝা বহন করো।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সর্বত্র সহজতা দান করেছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো সাহাবী সেই সহজতা গ্রহণ না করে নিজের ওপর কঠিন আমল চাপিয়ে নিয়েছিলেন। পরে সেজন্য অনেকে অনুশোচনাও করেছেন। যেমন আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজের ওপর দীর্ঘ কিয়াম আবশ্যক করে নিয়ে পরে তাতে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন-

ليتنى قبلت رخصة رسول الله

‘ইশ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওয়া অবকাশই যদি গ্রহণ করতাম!’

কারণ হচ্ছে, ধারাবাহিক আমল আল্লাহ তা‘আলার কাছে খুবই প্রিয়। তাই কিছুদিন সাধ্যের বাইরে মেহনত-মুজাহাদায় লিপ্ত থেকে পরে দুর্বল হয়ে সেটা বাদ দেয়ার চেয়ে সার্বক্ষণিক অল্প মুজাহাদাই উত্তম।

দশ. সর্বদা ছাত্রের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চাল-চলন, আদব-আখলাস ও স্বভাব-চরিত্রের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখবেন। তাদের দ্বারা নাজায়েয, মাকরূহ, অশিষ্টাচার, উস্তাদদের প্রতি বেয়াদবি কিংবা অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু প্রকাশ পেলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের নাম উল্লেখ না করে শাসন করা বেশি কার্যকর। এতে কাজ না হলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বারণ করতে হবে। তাতেও কাজ না হলে তখন প্রকাশ্যে কঠোরভাবে শাসন করা যাবে। যাতে তার শাস্তি দেখে অন্যরাও শিক্ষা পায়। আর তাতেও কাজ না হলে তখন শাস্তিমূলক কঠোর ব্যবস্থা নেয়া।

এগার. ছাত্রদের কল্যাণ সাধন এবং তাদের মন স্থির রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। দরকার হলে এবং সাধ্য থাকলে আর্থিক সহযোগিতা করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দার সঙ্গে থাকেন যে বান্দা অপরজনের উপকার করে। আর এই বিষয়টি যদি তালেবে ইলমের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তো এর ফযীলতের তুলনাই নেই। কোনো ছাত্র নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজখবর নেবেন, প্রয়োজনে চিঠি বা ফোনের মাধ্যমে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করবেন। কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা-যত্ন করবেন। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করবেন। পেরেশান হলে তাকে স্বান্তনা দেবে। মনে রাখতে হবে নেককার তালেবে ইলম উস্তাদের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের সবচেয়ে বড় সাফল্য বয়ে আনে এবং সেই তার সবচেয়ে বড় আত্মীয়-আপনজন।

বারো. ছাত্রদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবেন, যদি তারা তাদের যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেন। তার প্রতি কোমলতার ডানা সম্প্রাসারিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করে বলেন,

﴿ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢١٥ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]

'আপনি মুমিনদের মধ্যে আপনার অনুসারীদের জন্য বিনয়ের ডানা সম্প্রসারিত করুন।' {সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত ২১৫}

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا »

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিনয়ী হওয়ার আদেশ করেছেন।' [মুসলিম: ২৮৬৫]

অন্য হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ

'যে ব্যক্তি বিনয়ী হয় আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।' [মুসলিম: ২৫৮৮]

এটা তো সাধারণ মানুষের প্রতি বিনয়ী হওয়ার ফায়েদা। আর এটা যদি হয় সন্তানতূল্য তালেবে ইলমের প্রতি তাহলে তার মর্যাদা কত উঁচুতে হতে পারে? হাদীছে আরো বলা হয়েছে-

لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه

'তোমরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করো।' [তাখরীজু আহাদীছিল এহইয়া: ৩/২১৮, যঈফ]

ফুজাইল (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة

'আল্লাহ তা'আলা বিনয়ী আলেমকে পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য বিনয়ী হয় তিনি তাকে হিকমতের অধিকারী করেন।'

ছাত্রদের সঙ্গে তাদের মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলা, সম্বোধন করা এবং সুন্দর নাম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত-

كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكني أصحابه إكراماً لهم.

‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তাদের সম্মান রক্ষার্থে উপনামের সঙ্গে সম্বোধন করতেন।’

সুতরাং ছাত্ররা সাক্ষাত করতে এলে তাদেরকে মারহাবা বলা, হাসিমুখে কথা বলা আলেমের শান হওয়া চাই। আর যাদের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায় তাদের প্রতি একটু বেশি যত্ন নেওয়া বিচক্ষণতার পরিচয়। কারণ, হেকমতকে যথাস্থানে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চতুর্থ পর্ব: ছাত্রদের দায়িত্ব ও করণীয়

এক. নিজেকে ধোঁকা-প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, বদ আকীদা, বদমেজাজ ইত্যাদি পাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যাতে করে নিজের মধ্যে ইলম ও ইলমের সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয় প্রবেশ করার পথ খুলে যায়। কেননা বলা হয়ে থাকে-

إن العلم صلاة السر، وعبادة القلب، وقربة الباطن

'ইলম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সালাত, কলবের ইবাদত এবং গোপন নৈকট্য।'

সুতরাং সালাত যেমন বাহ্যিক অপবিত্রতামুক্ত হওয়া ছাড়া সহীহ হয় না তেমনিভাবে কলবের সালাত ইলমও সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার সঙ্গে কবুল হবে না। সালাফে সালেহীন আরো বলেন,

يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزرع، فإذا طيب العلم ظهرت بركته

'ভূমি যেমন শস্য ও ফসলাদি দ্বারা সজীব হয়ে ওঠে তেমনিভাবে অন্তরও ইলম দ্বারা সজীব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর যখন ইলমের সজীবতা সৃষ্টি হয় তখন বাহ্যিকভাবে এর নমুনা প্রকাশ পায়।'

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

« أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»

‘দেহে একটি গোস্তপিণ্ড আছে। যদি সেই গোস্তপিণ্ড ঠিক হয়ে যায় তবে সারা দেহ ঠিক থাকে। আর যদি সেটা ফাসেদ হয় তবে গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে সেই গোস্তপিণ্ড হচ্ছে কলব।’ [বুখারী: ৫২; মুসলিম: ১৫৯৯]

সাহল (রহ.) বলেন,

حرام على قلب أن يدخله نوَر وفيه شيء مما يكره الله عز وجل

‘ওই কলবের ভেতর ইলমের নূর প্রবেশ করানো হারাম, যে কলবে আল্লাহ তা‘আলার অপছন্দনীয় কিছু বিদ্যমান থাকে।’

দুই. ইলম হাসিলে নিয়ত সহীহ করে নেবে। আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন, দীন-ইসলামের প্রচার-প্রসার, নিজের ক্বলবকে নূরান্বিত করা, বাতেনকে সুশোভিত করা এবং সর্বোপরি উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে দীনী জাগরণ সৃষ্টি করার নিয়ত করতে হবে। নিয়তকে ঠিক রাখাই আসলে সবচেয়ে কঠিন কাজ। সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন,

ما عالجت شيئاً أشد من نيتي،

‘আমি নিয়তের পরিচর্যার চেয়ে বেশি কোনো বস্তুর পরিচর্যা করা কঠিন মনে করিনি।’

ইলম অর্জন করার দ্বারা কখনও দুনিয়া কামানোর নিয়ত করবে না। কেননা এটা হবে উত্তম বস্তুর তুলনায় অনুত্তম বস্তু গ্রহণ করা। কারণ ইলম হচ্ছে একটি ইবাদত। তাই এতে এখলাস থাকা অপরিহার্য। তবেই এতে বরকত হয়। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য

কিছুর নিয়ত করা হয় তবে আমল বাতিল হবে এবং সেটা চরম আক্ষেপ ও আফসোসের কারণ হবে।

তিন. যৌবনের মূল্যবান সময়গুলোকে ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করবে। ইলম বৈ অন্য কোনো কাজে ব্যয় করবে না। এজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও মেধা ব্যয় করতে হবে। মনে রাখবে-

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك.

'তুমি তোমার সর্বোচ্চ অংশ না দিলে ইলম তোমাকে কিছুই দান করবে না।'

চার. নিজের আর্থিক সঙ্গতির ওপরেই সন্তুষ্ট থাকবে। মনে রাখবে, অর্থকষ্ট ছাড়া ইলমের প্রশস্ততা হাসিল করা যায় না। যদি অন্তরকে যাবতীয় লোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত রাখা যায় তবেই দিলে হেকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح

'ইজ্জত ও রাজত্ব দিয়ে ইলম হাসিল করতে গিয়ে কেউ সফল হয়নি। বরং যে নিজের নফসকে বিলিয়ে দিয়ে, সংকীর্ণ জীবিকাতে সন্তুষ্ট হয়ে এবং ওলামায়ে কেরামের খেদমত করে ইলম হাসিল করেছে একমাত্র সেই সফল হয়েছে।'

তিনি আরো বলতেন,

لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل

‘নফসের যিল্লতি ছাড়া ইলম হাসিল করা যায় না।’

যে ব্যক্তি পেশা ও অর্থ উপার্জনের ওপর ইলম অর্জনকে প্রাধান্য দেবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে এর বদলায় উত্তম ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে কল্পনাতীত রিযিক দান করবেন।

পাঁচ. সময়কে ভাগ করে কাজে লাগাবে। হিফজের জন্য সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাতের শেষপ্রহর, গবেষণার জন্য ভোর, লেখালেখির জন্য দিনের মধ্যভাগ এবং মুতালাআ-মুজাকারার জন্য রাত। রাতের বেলায় হিফজ করা দিনের বেলায় হিফজ করার চেয়ে বেশি উপকারী এবং ক্ষুধার্তের সময় পরিতৃপ্তি সময়ের চেয়ে বেশি উপকারী। আর হিফজ করার স্থান হিসেবে মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটায় এধরনের প্রাকৃতিক ও সৌন্দর্যময় স্থান থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। যেমন, সবুজ বাগান, নদীর পাড়, রাস্তার পার্শ্ব, হইচই-চেচামেচির স্থান ইত্যাদি। কেননা এসব স্থান মানুষের কলবের স্থিতি নষ্ট করে।

ছয়. ইলমের সূক্ষ্ম বিষয় চর্চা, সহীহ সমঝ হাসিল এবং ক্লান্তি থেকে বেঁচে থাকার নিরাপদ উপায় হচ্ছে অল্প পরিমাণ হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

ما شبعت منذ ست عشرة سنة

‘আমি ষোল বছর ধরে পেট পূর্ণ করে খানা খাইনি।’

এর কারণ হচ্ছে অধিক আহার অধিক পিপাসার কারণ। আর অধিক পিপাসা ঘুম আনয়ন করে, মেধা দুর্বল করে এবং শারীরিক প্রফুল্লতা

খতম করে। এছাড়া শারীরিক রোগ-ব্যাধির ব্যাপার তো আছেই। বলা হয়-

فإن الداء أكثر ما تراه ... يكون من الطعام أو الشراب

'অধিকাংশ রোগ যা তোমরা দেখ, তা হয়ে থাকে খাদ্য বা পানীয়ের কারণে।'

সুতরাং যে ব্যক্তি অধিক পানাহার সত্ত্বেও ইলম অর্জনে সাফল্য চায় সে বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করে। তাই খাবার গ্রহণে স্বল্পতা আবশ্যক। এক্ষেত্রে হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে অধিক ফল পাওয়া যাবে। হাদীছে বলা হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنَ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

'মানবসন্তানের পেট পূর্ণ করার চেয়ে অন্য কোনো পাত্র পূর্ণ করা এত নিকৃষ্ট নয়। তার জন্য তো মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট। আর যদি তাতে না হয় তবে কেন সে পেটের একভাগ খাবার, একভাগ পানি এবং একভাগ তার নিজের জন্য বরাদ্দ করে না?' [মুসনাদ আহমাদ: ১৭১৮৬]

হাদীছের ব্যাখ্যায় পূর্বসূরীগণ বলেন,

لَيْسَ لِلْبِطْنَةِ أَنْفَعُ مِنْ جَوْعَةٍ تَتْبَعُهَ

‘পেটের জন্য অব্যাহত ক্ষুধানিপীড়নের চেয়ে উপকারী কোনো বস্তু নেই।’

সাত. যাবতীয় কাজকর্মে তাকওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করবে। পানাহার, লেবাস-পোশাক সর্বত্র হালাল পন্থা অবলম্বনে কঠোর থাকবে। সকল প্রকার সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকবে।

আট. শরীর ও জেহেন সুস্থ রাখে এই পরিমাণ ঘুমাবে। রাতদিনে সর্বোচ্চ আট ঘণ্টার বেশি ঘুমাবে না। এটাই হচ্ছে দিনের এক তৃতীয়াংশ। আর যদি এর চেয়ে কম পারা যায় তবে সেটাই করা উচিত। আর মাঝেমধ্যে নফস, কলব, জেহেন এবং দৃষ্টিকে চাঙ্গা করার জন্য বৈধ কৌতুক করা যেতে পারে। তবে এটা করতে গিয়ে সময়, দীন ও আমলের কোনোরূপ ক্ষতি করা যাবে না। আমাদের পূর্বসূরীগণগণের অনেকে তাদের ছাত্রদেরকে বিনোদনের স্থানে জমায়েত করতেন এবং দীনের ক্ষতি হয় না- এমন বিষয় নিয়ে হাসি-কৌতুকও করতেন। তবে অবশ্যই অবৈধ হাসি-কৌতুক, ঠাট্টা-মশকরা, অট্টহাসির আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

নয়. তালেবে ইলমের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষতিকর বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকা। বিশেষ করে যদি ভিন্ন শ্রেণীর এবং খেলাধূলায় অভ্যস্ত ও নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল বন্ধু হয় তবে তো কথাই নেই। সুতরাং তালেবে ইলমের কর্তব্য হচ্ছে এমন ছাত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা, যে নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও উপকৃত করে।

আলেমের প্রতি মহব্বত লাভের জন্য ইলমের প্রতি মহব্বত থাকা পূর্বশর্ত। সুতরাং মহব্বতের মাপকাঠি হওয়া দরকার ইলম। অতএব যে ব্যক্তি বন্ধু হবে তাকে অবশ্যই ইলমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং সে বন্ধুর ইলম হাসিলে ক্ষতিকর এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।

যদি ইলমের জন্য ক্ষতিকর কোনো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েই যায় তবে দ্রুত তা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। বিলম্ব হলে তা দূর করা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। তাই আবার বলি, বন্ধুত্ব করতে চাইলে এমন লোকের সঙ্গেই করতে হবে, যে নেককার, দীনদার, মুত্তাকি, অধিক কল্যাণের আধার, কম খারাপের অধিকারী, সদাচার। যদি ভুলে যায় তবে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাকে স্মরণ করালে সহজে মেনে নেয়। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

لا تصحب أخا الجهل ... و إيَّاك وإيَّاه

فكم من جاهل أردى ... حليماً حين آخاه

'তুমি কখনও জাহেলকে বন্ধু বানিয়ো না। অনেক জাহেল ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত করেছে।'

কেউ কেউ বলেন,

إن أخاك الصدق من كان معك ... و من يضر نفسه لينفعك

'তোমার প্রকৃত বন্ধু সেই, যে নিজের ক্ষতি করে হলেও তোমার উপকার করে।'

দশ. কষ্ট করা ছাড়া ইলম হাসিল করা যায় না- সর্বদা একথা মনে রাখবে। কেননা ইলম অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর কোনো বস্তু দিয়ে এর মূল্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর একথা চিরসত্য যে, মূল্যবান বস্তু কষ্ট স্বীকার করেই হাসিল করতে হয়। মূল্যবান বস্তু শ্রম দেওয়া ছাড়া হাসিল হওয়ার কোনো নজির নেই। একারণে আমাদের পূর্বসূরীগণ ইলম হাসিলের জন্য কষ্ট স্বীকার করাকে ইলমের সুন্নাত বলে মনে করতেন। তারা নিজেরাও কষ্ট স্বীকার করতেন এবং অন্যকেও এব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তারা বলতেন, সুদীর্ঘকাল সম্মানিত হতে হলে সামান্য সময় কষ্ট স্বীকার ও নিজেকে বিলিয়ে দিতেই হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

يا نَفسُ ما هِيَ إِلّا صَبرُ أَيّامِ ... كَأَنَّ مُدَّتَها أَضغاثُ أَحلامِ

يا نَفسُ جوزي عَنِ الدُنيا مُبادِرَةً ... وَخَلِّ عَنها فَإِنَّ العَيشَ قُدامي

‘হে আত্মা! এ তো সামান্য সময়ের জন্য ধৈর্য ধারণ মাত্র। যেন এর সময়কাল ভ্রান্ত স্বপ্নকালের মতোই সংক্ষিপ্ত। হে আত্মা! দুনিয়া থেকে দ্রুত পৃথক হয়ে যাও। কেননা সুখ-সমৃদ্ধি তো সব সামনে।’

৫ম পর্ব:

উস্তাদ ও শায়খদের সঙ্গে তালেবে ইলমের ব্যবহার

এক. ছাত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কোন মাদরাসায় ও কোন উস্তাদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করবে তা ইস্তেখারার মাধ্যমে নির্ধারণ করা। কোথায় তার মেধার বিকাশ ঘটবে, উস্তাদগণের স্নেহপ্রবণতায় নিজের ইলমী যোগ্যতা বিকশিত হবে, তাকওয়া-পরহেজগারী, সততা-দীনদারী অর্জন হবে, লেখাপড়ার মান নিশ্চিত হবে ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তবে বেশি ইলম হাসিল করতে গিয়ে কিংবা প্রসিদ্ধি হাসিল করতে গিয়ে দীন, আমল ও শিষ্টাচার বিসর্জন দিতে হয় এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা যাবে না। আকাবিরে সলফ বলতেন,

هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

‘এটা হচ্ছে দীন। সুতরাং আপনি দেখুন, কার কাছ থেকে ইলম তথা দীন হাসিল করবেন।’

আমলহীন প্রসিদ্ধ লোকদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করার চেষ্টা করবে না। ইমাম গাযালী (রহ.) এটাকে অহংকারের মধ্যে শামিল করেছেন। কারণ মূল হচ্ছে ইলম হাসিল করা। বলা হয়-

الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها

‘প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানে তা পায় কুড়িয়ে নেয়।’ অতএব এখানে ব্যক্তিত্বের অহংবোধ গৌণ। তাই যেখানেই বিশুদ্ধ ইলম পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে যাবে এবং বাঘ থেকে পলায়ন করার ন্যায় মূর্খতা থেকে পলায়ন করবে। আর বাঘ থেকে পলায়নকারী ব্যক্তি কিন্তু যে-ই তাকে মুক্তির পথ দেখায় তার কথাই মানে। তার ব্যক্তিত্বের খোঁজ-খবর করতে যায় না। আবূ নুআইম হিলয়াগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জয়নুল আবেদীন (রহ.) গোলাম যায়দ ইবন আসলামের কাছে যেতেন এবং তার মজলিসে বসে ইলম হাসিল করতেন। কেউ তাকে বললেন, আপনি সাইয়েদ বংশের লোক হয়ে এই গোলামের কাছে যাচ্ছেন! জবাবে তিনি বললেন-

العلم يُتَبع حيث كان ومن كان

‘ইলম হচ্ছে অনুসরণীয়। চাই যার কাছেই হোক এবং যেখানেই হোক।’

‘তাই মর্যাদায় নিচু হলেও তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করাতে দোষ নেই এবং এতে মর্যাদা বাড়বে, ইলমে বরকত হবে। অবশ্য মুত্তাকী, পরহেগার ব্যক্তি হলে তার মাধ্যমে তো আরো বেশি উপকৃত হওয়া যাবে, এত কোনো সন্দেহ নেই। কিতাবের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। যে কিতাব দ্বারা সত্যিকারের ইলমী উপকারিতা হাসিল হয়, আমলের উন্নতি ঘটে তা পাঠ করতে কার্পণ্য করবে না।

তবে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, উস্তাদ যেন শরীয়তের ইলমের ব্যাপারে দক্ষ হন। তার ব্যাপারে সমকালীন ব্যক্তিগণ আস্থাশীল

থাকেন। যে আলেম শুধু কিতাবের পেট থেকে ইলম হাসিল করেছেন তার কাছে ইলম হাসিল করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام،

'যে ব্যক্তি কিতাবের পেট থেকে ইলম হাসিল করে সে আহকামকে ধ্বংস করে।'

অন্য এক বুযুর্গ বলেন,

من أعظم البلية مشيخة الصحيفة، أي الذين يتعلمون من الصحف

'কিতাবী শায়খ' হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ অর্থাৎ যারা শুধু কিতাবের পাতা থেকে ইলম অর্জন করে তারা জাতির জন্য বিপদের কারণ।'

দুই. উস্তাদকে জটিল রোগীর দক্ষ চিকিৎসক মনে করে তার যাবতীয় আদেশ ও পরামর্শ মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। তার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখবে এবং খেদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা করবে। আর একথার দৃঢ়বিশ্বাস রাখবে যে, উস্তাদের জন্য নিজের যিল্লতিতে প্রকৃত সম্মান, বিনয়ী হওয়াতে ফখর এবং নম্র হওয়াতে উচ্চমর্যাদা নিহিত। ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের মতো এমন সম্মানী ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও যায়দ ইবন ছাবেতের

বাহনের রেকাবি ধরতেন। কারণ তিনি তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন। আর তিনি একথা বলতেন,

هكذا أمرنا إن نفعل بعلمائنا

‘আমরা আমাদের উস্তাদ ও আলেমদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতেই আদিষ্ট হয়েছি।’ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ، وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ»

‘ইলম হাসিল করো এবং ইলম হাসিল করার জন্য গাম্ভীর্য শিক্ষা করো। আর যার কাছ থেকে ইলম হাসিল কর, তার প্রতি বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হও।’ [মু‘জামুল আওসাত: ৬১৮৪, যঈফ]

মনে রাখতে হবে বিনয়ী হওয়া ছাড়া এবং আনুগত্য প্রদর্শন করা ছাড়া ইলম হাসিল করা যায় না। অতএব ইলমী বিষয়ে উস্তাদের যে কোনো পরামর্শ মাথা পেতে মেনে নেবে। নিজের ‘সঠিক বুঝে’র ওপর উস্তাদের ‘ভুল বুঝ’কেই প্রাধান্য দেবে।

তিন. উস্তাদকে সর্বদা মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখতে হবে। তার মর্যাদায় বিশ্বাস রাখবে। কেননা এটা নিজের উপকারিতার জন্য খুবই ফলদায়ক। জনৈক দার্শনিক বলেন,

حسن الأدب ترجمان العقل

‘শিষ্টাচার ব্যক্তির আকলের মুখপাত্র।’

উস্তাদকে সরাসরি ‘আপনি’, ‘সে’, ‘তিনি’ ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করবে না। বরং: يا شيخنا ويا أستاذنا ‘মুহতারাম’, ‘সাইয়েদ’ ইত্যাদি পূর্ণ সম্মানজনক বাক্যে সম্বোধন করবে। ‘উস্তায এ বিষয়ে কী বলেন’, ‘এ ব্যাপারে উস্তাযের রায় কী’ এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করবে। আর অনুপস্থিতিতে এমন কোনো শব্দ উল্লেখ করে তাকে স্মরণ করবে না, যাতে তার মর্যাদাহানী হয়। বরং সম্মান ও মর্যাদাজ্ঞাপক শব্দে স্মরণ করবে। যেমন, মুহতারাম শায়খ....বলেছেন, উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা...বলেছেন ইত্যাদি।

চার. উস্তাদের মর্যাদা ও হক রক্ষা করে চলবে। তার মর্যাদাহানী ঘটাবে না। আবূ উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

من علم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه

‘যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে একটি আয়াত শিক্ষা দিলো তবে তিনি তার মুনিব।’

এসব কারণে উপস্থিত-অনুপস্থিত উভয় অবস্থাতেই উস্তাদের সম্মান করবে। আর যদি একান্তই এসব করতে না পারে তবে ওই মজলিস ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে। ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে, জীবদ্দশায় উস্তাদের জন্য দু‘আ করবে, তার সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয়দের জন্য দু‘আ করবে এবং মৃত্যুর পরও তার হক রক্ষা করবে এবং কবর যিয়ারত ও ইস্তেগফার করবে। তার পক্ষ থেকে কিছু দান-

সদকা করবে। উস্তাদের ইক্তেদা ও আদর্শ কখনও পরিত্যাগ করবে না।

পাঁচ. উস্তাদ কর্তৃক কোনো কঠোরতার সম্মুখীন হলে তাতে সবর করবে এবং এর ভালো ব্যাখ্যা দাঁড় করবে। এর জন্য কখনই তার মহব্বত ও বিশ্বাস ত্যাগ করবে না। এতেই ছাত্রদের অফুরন্ত কল্যাণ। এক মনীষী বলেন,

من لم يصبرعلى ذل التعليم بقي عمره في عملية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة.

‘যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করতে গিয়ে উস্তাদের লাঞ্ছনা বরদাশত করতে পারে না, সারাজীবন তার মূর্খতার মধ্যে কেটে যায়। আর কেউ বরদাশত করলে সেটা তার দুনিয়া-আখেরাতের মর্যাদায় পরিণত হয়।’

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

ذللت طالباً فعززت مطلوباً

‘ছাত্র থাকতে লাঞ্ছনা বরদাশত করেছি। তাই উস্তাদ হয়ে মর্যাদা লাভ করতে পেরেছি।’

জনৈক মনীষী বলেন,

اصبر لدائك إن جفوت طبيبه ... و أصبر لجهلك إن جفوت معلما

‘যদি চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করো তবে অসুস্থতার ওপর সন্তুষ্ট থাকো এবং যদি উস্তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো তবে মূর্খতার ওপর ধৈর্যধারণ করো।’

ছয়. উস্তাদের কঠোরতা ও শাসনকে নিজের জন্য একথা ভেবে নেয়ামত বলে মনে করবে যে, তিনি আমার সংশোধন ও ভালোর জন্য আমার প্রতি খেয়াল রাখছেন বলেই শাসন ও কঠোরতা করছেন।

সাত. আম মজলিস ছাড়া অনুমতি ছাড়া উস্তাদের অবস্থানকক্ষে প্রবেশ করবে না। চাই তার সঙ্গে অন্য কেউ থাকুক বা না থাকুক। বার বার অনুমতি তলব করবে না। যদি জানা যায় যে, উস্তাদ তার অনুমতি তলবের বিষয়ে অবগত আছেন তবে তিনবারের বেশি অনুমতি তলব করবে না। যদি দরজায় করাঘাত করতে হয় তবে খুব মৃদভাবে, আঙুলের নখ দিয়ে আঘাত করবে। অতপর আঙুল দিয়ে করবে। শেষে হাতের তালু দিয়ে করবে। অনুমতি লাভ করার পর যদি আম মজলিস লক্ষ্য করা যায় তবে পর্যায়ক্রমে মর্যাদার দিক দিয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করতে থাকবে। আর উচিত হচ্ছে উস্তাদের কাছে পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় গায়ে প্রবেশ করা। হাত-পায়ের নখ কর্তিত এবং চুল পরিপাটি থাকা। উস্তাদের কাছে কেউ থাকলে এবং তারা কথাবার্তায় লিপ্ত থাকলে সেখানে গিয়ে কথা না বলে নিশ্চুপ থাকা। আর উস্তাদ যদি একাকী থাকেন কিংবা সালাত, যিকির, লেখা বা মুতালাআয় নিমগ্ন থাকেন এবং তিনি নিজে থেকে কথা শুরু না করেন তবে সালাম দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে

বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তিনি অবস্থান করার ইশারা করলে অবস্থান করবে এবং অনুমতি ছাড়া সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করবে না।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও ফারেগ কলব নিয়ে উস্তাদের কাছে হাজির হবে। মানসিক উত্তেজনা, ক্ষুৎপিপাসা, রাগ-ক্রোধ, ঘুম-তন্দ্রাভাব ইত্যাদি অবস্থায় প্রবেশ করবে না। যাতে উস্তাদ থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং তিনি যা বলেন তা যথাযথভাবে ধরে রাখা যায়। উস্তাদের কাছে এমন কোনো সময় পড়া জিজ্ঞেস করবে না, যখন তা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিংবা যে সময় তার একান্তই অন্য কাজের জন্য নির্দিষ্ট। উস্তাদের কাছে নিজের জন্য কোনো সময় খাস করে নেবে না, যাতে অন্য কেউ শরীক না হতে পারে। কেননা এটা অবাঞ্ছিত বড়ত্ব ও উস্তাদের প্রতি মূর্খদের আচরণের শামিল।

আট. উস্তাদের সামনে ভদ্রভাবে উপবেশন করবে। সে সময় নম্রতা, বিনয় ও নিরবতা পালন করবে। উস্তাদের প্রতি তাকিয়ে থাকবে এবং কর্ণ খাড়া রাখবে। সব কথা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করবে যাতে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। এদিক ওদিক তাকাবে না এবং হাতের আস্তিন গোটাবে না, হাত-পা নিয়ে খেলা করবে না। দাড়ি-গোঁফ ও নাকে হাত দেবে না এবং নাক থেকে কিছু বের করবে না। কেননা এটা খুবই আপত্তিকর এবং ঘৃণিত স্বভাব। মুখ খোলা রাখবে না এবং দাঁত দিয়ে আওয়াজ করবে না। হাতের তালু দিয়ে মাটিতে আঘাত করবে না কিংবা হাতের আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ টানবে না। হাতের আঙুল হাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করবে

না। উস্তাদের সামনে দেয়াল বা অন্য কিছুর সঙ্গে হেলান দেবে না। উস্তাদের দিকে পিঠ বা পার্শ্ব দিয়ে বসবে না। প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত কথা বলবে না। এমন কোনো কথা বলবে না, যাতে হাসির উদ্রেক হয় কিংবা যাতে অশ্লীল বাক্য মেশানো থাকে অথবা অশিষ্টাচারপূর্ণ সম্বোধন থাকে। বিনা কারণে হাসাহাসি করবে না এমনকি কারণ থাকলেও উস্তাদের সামনে অমার্জিত ভঙ্গিতে হাসবে না। যদি একান্তই হাসির উদ্রেক হয় তবে শব্দ না করে মুচকি হাসি দেবে। প্রয়োজন ছাড়া গলা খাকাড়ি দেবে না। থুথু নিক্ষেপ করবে না। নাক থেকে শ্লেষ্মা বের করবে না। বরং বিনা শব্দে তা রুমাল বা কাপড়ের টুকরায় মুছে ফেলবে। আলোচনা-পর্যালোচনার সময় হাত ও পা সংযত রাখবে।

উস্তাদকে এরূপ বলবে না যে, 'অমুকে আপনার মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।' তার সামনে কারো গীবত করবে না এবং যদি তার দ্বারা কোনো ভুলত্রুটি হয়ে যায় তবু তার দোষ তালাশ করবে না। নিঃসন্দেহে একজন আলেম মুমিনের মর্যাদা অনেক। তাদের কেউ মারা গেলে ইসলামে এমন একটি ছিদ্র দেখা দেয়, যা কোনো কিছু দ্বারা ভরাট করা সম্ভব নয়। খতীব বাগদাদী (রহ.) 'আল-জামে' গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

وإن المؤمن العالم لأعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله، وإذا مات العالم، انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يو م القيامة.

‘একজন আলেম নিঃসন্দেহে প্রতিদানপ্রাপ্তির বিবেচনায় রোজাদার, নফল সালাতে রাত্রিজাগরণকারী এবং আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় মুজাহিদের চেয়ে বড়। আর একজন আলেম মারা গেলে ইসলামে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয়, যা কেয়ামত পর্যন্ত কোনো বস্তু দ্বারা ভরাট করা সম্ভব নয়।’

উস্তাদের আসনে, বিছানায় বা জায়নামাজে বসবে না। উস্তাদ যদি বসতে বলেন তবু না বসার চেষ্টা করবে। আর যদি একান্তই আদেশ করেন এবং তা পালন না করলে তার মনোকষ্ট হয় তখন বসবে এবং পরে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।

নয়. উস্তাদ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে কান পেতে তা শ্রবণ করবে এবং এমনভাবে তা শ্রবণ করবে যেন কোনোদিন তা শোনা হয়নি। এটা শ্রোতার শিষ্টাচার। আতা (রহ.) বলেন, ‘আমি অনেক সময় কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে একটি কথা শুনি। সে সম্পর্কে আমি বেশি জানি তবু এমন ভাব করি যাতে মনে হয় তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘অনেক সময় যুবক-তরুণ আমার সামনে কথা বলে আর তা আমি এভাবে শ্রবণ করি যে, মনে হয় আমি কোনোদিন তা শ্রবণ করিনি। অথচ আমি তার বহু আগ থেকেই তা জানি!’

উস্তাদ যদি তার বক্তব্য শুরু করার আগে ছাত্ররা জানে কিনা-জিজ্ঞেস করেন এবং ছাত্রদের তা জানাও থাকে, তবু হ্যাঁ বলবে না। কেননা এটা উস্তাদের ইলমের প্রতি অনীহা বুঝায়। আবার না-ও

বলবে না। কেননা তা মিথ্যাকথন হয়ে যায়। বরং বলবে, উস্তাযের মুখে শুনতে চাই অথবা উস্তাযের বর্ণনা আমাদের জানার চেয়ে বেশি শুদ্ধ ইত্যাদি।

দশ. উস্তাদের কথার আগে কথা বলবে না এবং তার বক্তব্যের আগে বক্তব্য শুরু করবে না। উস্তাদের আগ থেকেই উক্ত বিষয় জানার দাবি করবে না এবং উস্তাদ যে ধরনের বিষয়েই কথা বলুন না কেন, সে কথা কাটার চেষ্টা করবে না। বরং তার কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবে। সাহাবীগণের আমল ছিল এরূপ-

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأن على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا

‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলতেন, তখন সাহাবীগণ মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতেন। যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসা রয়েছে। তিনি যখন নীরব হতেন সাহাবীগণ তখন কথা বলা শুরু করতেন।’

এগার. উস্তাদ কোনো কিছু প্রদান করলে ডানহাতে গ্রহণ করবে এবং তাকে দেয়ার সময়েও ডানহাত দিয়ে দেবে। উস্তাদের কোনো বস্তুর ওপর নিজের বস্তু রাখবে না। তার দিকে হাত, চোখ বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে ইশারা করবে না। তাকে লেখার জন্য কলম দেয়ার প্রয়োজন হলে দেয়ার আগে কলমের হেড খুলে দেবে। সামনে দোয়াত রাখলে মুখ খুলে দেবে এবং তড়িৎ লেখার উপযোগী করে পেশ করবে। তার ছুরি ইত্যাদি দিলে ধারালো অংশ

আড়ালে রেখে বাড়িয়ে দেবে। আর কখনও উস্তাদের খেদমত করে ক্লান্তি বা লজ্জাবোধ করবে না। বলা হয়ে থাকে-

أربعة لا يأنف الشريف منهم وإن كان أميراً، قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته للعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلمه وخدمته للضيف.

‘চার ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লজ্জাবোধ করে না, যদিও তিনি বাদশা হোন না কেন। পিতার কাছে পুত্রের দণ্ডায়মান হওয়া, উস্তাদের খেদমতে তালেবে ইলমের নিয়োজিত হওয়া, না জানা বিষয় জিজ্ঞেস করা এবং মেহমানের খেদমত করা।’

বার. উস্তাদের সঙ্গে রাতে চললে সামনে সামনে এবং দিনে চললে পেছনে পেছনে চলবে। অবশ্য এর বিপরীত কোনো অবস্থা পালন করতে হলে সেটা ভিন্ন কথা। অপরিচিত জায়গায় আগে আগে চলবে। অপরিচিত লোকদের সামনে উস্তাদকে পরিচিত করিয়ে দেবে। উস্তাদ দূরে থাকলে উচ্চস্বরে ডাক দেবে না এবং পিছন থেকেও ডাকবে না। উস্তাদ কোনো বিষয়ে ভুল করে থাকলে সরাসরী সেটাকে ভুল আখ্যায়িত করবে না এবং এরূপ বলবে না যে, আপনার এই কাজটা ভুল বা এটা কোনো মতই নয়। বরং মার্জিতভাবে তাকে স্বীয় ভুল সম্পর্কে অবহিত করবে। যেমন এরূপ বলবে যে, ‘মনে হয় এরূপ করা ভালো হবে।’ কিন্তু ‘আমার মতে এরূপ করা ভালো হবে’ এরকম কথা বলবে না।

৬ষ্ঠ পর্ব: দরসের আদব

এক. প্রথমে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব দিয়ে শুরু করবে। সুতরাং তা মজবুতভাবে হিফজ করবে এবং এর অর্থ ও তাফসীর আত্মস্থ করতে সচেষ্ট হবে। কেননা এটাই হচ্ছে ইলমের উৎস ও জননী। এরপর অন্যান্য শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী সংক্ষিপ্ত আকারে মুখস্ত করবে। ফিকহ, উসুলে ফিকহ, হাদীছ, উলুমে হাদীছ, নাহব, সরফ, মানতেক ইত্যাদি শাস্ত্র মজবুতভাবে আয়ত্ব করবে। কিন্তু কুরআন বাদ দিয়ে নয়। আর কুরআন ও অন্যান্য শাস্ত্র নিয়মিত চর্চা করবে। কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা শিখবে এবং তা ধরে রাখবে। শাস্ত্র আত্বস্ত করতে গিয়ে নিছক কিতাবের ওপর নির্ভর করবে না বরং শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নেবে।

দুই. দরসের সূচনাতেই মাসআলাগত মতভেদের মধ্যে পড়বে না এবং মানতেক-দর্শনশাস্ত্রও না। কেননা এগুলো জেহেনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বরং প্রথমে নির্দিষ্ট কোনো শাস্ত্রের একটি কিতাব পাঠ করবে। তবে সমর্থ থাকার শর্তে উস্তাদের সম্মতি ও পরামর্শ সাপেক্ষে একই পদ্ধতিতে একাধিক শাস্ত্রের একাধিক কিতাব পাঠ করা যেতে পারে। যে উস্তাদ মাজহাব ও মতভেদ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট কোনো রায় বা সমাধান প্রদান করেন না তার দরসে শরীক হওয়া লাভের চেয়ে ক্ষতিকর। এমনিভাবে সূচনাতে নানান কিসিমের একাধিক শাস্ত্র অধ্যায়ন করাও ক্ষতিকর। এতে সময় ও জেহেন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বরং নিয়ম হলো একটি শাস্ত্র নিয়ে তা পুরোপুরি

আত্বস্থ করে অন্য শাস্ত্র ধরা। ইমাম বায়হাকী (রহ.) লেখেন, ‘ইমাম শাফেয়ী (রহ.) জনৈক আদীবের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, ছাত্রদের ইসলাহ করার আগে নিজের নফস শুদ্ধ করুন। কেননা তাদের দৃষ্টি থাকবে আপনার চোখে নিবদ্ধ। সুতরাং তাদের কাছে তাই সুন্দর, যা আপনার কাছে সুন্দর। আর তা অসুন্দর, যা আপনি পরিহার করেন। তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব শিক্ষা দিন। তবে এর জন্য জোড়াজুড়ি করবেন না। কেননা তাতে বিরক্তি সৃষ্টি হবে। আবার একেবারে ছেড়েও দেবেন না। এতে তারা কুরআন শিক্ষা ছেড়ে দেবে। শিক্ষার্থীকে কবিতার সুন্দর অংশ শিক্ষা দিন। উত্তম কথার বর্ণনা দিন। ইলম ছাড়া তাদেরকে অন্য কিছুতে নিয়ে যাবেন না। কেননা, একসঙ্গে একাধিক বিষয় শ্রবণ ভ্রষ্টতা সৃষ্টি করে।’

আর ছাত্ররা যখন পরিণত হবে তখন সব শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তাতে পাণ্ডিত্য অর্জন করাতে দোষ নেই। কারণ এটা তার ভবিষ্যত জীবনে কাজে দেবে। নূন্যতম মূর্খতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য আসবে। তবে ইলমের মূল লক্ষ্য আমলের কথা কখনই ভোলা যাবে না!

তিন. উস্তাদের তত্ত্বাবধানে বিশুদ্ধ ইলম হাসিল করার পর তা মুখস্থ করবে। শুদ্ধ করার আগে কোনো বস্তু মুখস্থ করবে না। কেননা তাতে বিকৃতি ঘটে এবং পরে শুদ্ধতায় ফিরে আসা কঠিন হয়। আমরা আগেই বলে এসেছি, কিতাবকে উস্তাদ বানিয়ে ইলম হাসিল করা খুবই বিপদজনক ব্যাপার। একারণে কেউ কেউ দরসের

মজলিসে লিখতে বারণ করে থাকেন। কেননা এতে উস্তাদের কথা বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চার. হাদীছ পাঠের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। গতানুগতিকভাবে এই দরস শেষ করবে না। কারণ হাদীছ হচ্ছে ইলমের দ্বিতীয় প্রধান বাহু। সুতরাং হাদীছের অর্থ, তাৎপর্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শাব্দিক অর্থ, ইতিহাস, সনদ ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করবে। বর্তমান সময়ে প্রচলিত হাদীছের দরস ব্যবস্থার ওপর আত্মতুষ্টি প্রকাশ করবে না, বরং উচ্চতর গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

পাঁচ. ছাত্রকে ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে উচ্চ হিম্মতের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাকে সামান্য ইলমে সন্তুষ্ট থাকা এবং ইরছে নববীর সামান্য অংশ পেয়েই পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা যাবে না। ইলমী ফায়েদা হাসিল হওয়ার সুযোগ আসলে সেটা হাতছাড়া করা যাবে না। ভবিষ্যতে শেখা যাবে- এরূপ ধারণায় ইলমী ফায়েদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা বিলম্ব আর গাফলতিতে বঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। কেননা আজ একটা শিখলে ভবিষ্যতে আরেকটা শেখা যাবে। কিন্তু আজ না শিখলে তখন কোনটা শিখবে, আজকের ফেলা যাওয়াটা না সেই সময়েরটা? অবসর এবং মুক্ত সময়ের গুরুত্ব দেবে এবং কাজে লাগাবে। সুস্থতা, তারুণ্য, মানসিক প্রফুল্লতা এবং কম ব্যস্ততার সময়ের মূল্যায়ন করবে। মুখস্থ বিষয়গুলো ধরে রাখার চেষ্টা করবে এবং সামনে আরো বেশি নতুন বিষয় শেখার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে, কাঁধে দায়িত্ব চেপে বসলে

তখন আর ইলম চর্চার সুযোগ পাবে না। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

‘দায়িত্ব ও নেতৃত্ব লাভের আগেই ইলম হাসিল করে নাও।’

কেননা একবার নেতৃত্ব কাঁধে আসলে পুনরায় ইলমের মজলিসে বসার সুযোগ নাও হতে পারে। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন রবিআর মজলিসে বসতেন এবং রাজদায়িত্ব গ্রহণ করতেন পরে আর ইলমের মজলিসে ফিরে আসার সুযোগ হতো না। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (রহ.) বলেন,

من عاجل الرئاسة فاته علم كثير.

‘যে ব্যক্তি একবার ক্ষমতার মসনদে বসে সে অনেক ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

تفقه قبل إن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى الفقه

‘নেতা হওয়ার আগে ফিকহ অর্জন করো। কেননা নেতা হওয়ার পর ফিকহ হাসিলের পথ পাবে না।’

আর নিজের চোখে নিজেকে পূর্ণ ভাবার এবং উস্তাদের প্রয়োজনীয়তা শেষ মনে করার ব্যধি থেকে হেফাজতে থাকবে। কেননা এটা স্পষ্ট

মূর্খতা। কারণ যে কোনো মানুষের জানার চেয়ে না জানার পরিমাণ বেশি। সাঈদ ইবন জুবায়র (রহ.) বলেন,

لا يزال الرجل عالماً ما تعلم

'মানুষ ততদিনই আলেম থাকে যতদিন সে শেখে।'

যখন সব শাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা এবং অধ্যয়নের যোগ্যতা পয়দা হবে তখন লেখালেখি শুরু করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আকাবিরের অনসৃত পথ ধরে চলতে হবে।

ছয়. উস্তাদের দরসে নিয়মিত হাজির থাকবে। কেননা তা কেবল কল্যাণ ও ইলম, আদব ও মর্যাদাই বৃদ্ধি করবে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة ينتظر متى يسقط عليك منها شيء

'উস্তাদের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় থাকায় পরিতৃপ্ত হয়ো না। কেননা তিনি একটি খেজুর গাছের মতো, যা থেকে তোমার ওপর সর্বদা কিছু পড়ার আশা করা যায়।'

দরসে উস্তাদ হাজির হওয়ার আগেই নিজেরা হাজির হবে এবং উস্তাদ হাজির হওয়ার পর কোনোভাবেই অনুপস্থিত থাকা যাবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন,

من الأدب مع المدرس إن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم

‘উস্তাদের প্রতি আদব হচ্ছে তার অপেক্ষায় থাকা, তাকে অপেক্ষায় রাখা নয়।’

আরো আদব হচ্ছে দরসে তন্দ্রা-নিদ্রা, কথাবার্তা, হাসি-তামাশা থেকে বিরত থাকা। উস্তাদ যে বিষয়ে আলোচনা করছেন সে বিষয়ের বাইরে কথা না বলা। তার খেদমতের জন্য সদা তৎপর থাকা। কেননা এটা তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব আনয়নকারী। দরস শেষে জেহেন বিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই পঠিত বিষয়গুলো পুনরায় মুজাকারা করে নেওয়া এবং পরেও মুজাকারা করা। আর মুজাকারার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাত্রি। আমাদের পূর্বসূরীগণ রাতে মুজাকারা করতেন এবং কখনও কখনও ফজরের আযান শুনে মুজাকারা ছাড়তেন! কোনো ছাত্র যদি মুজাকারার সঙ্গী না পায় তবে নিজে নিজেই মুজাকারা করবে। অন্তরে ওই শব্দের অর্থ বারবার বসাবে। কেননা বারবার অন্তরে অর্থ স্থান দেওয়া জবানে বারবার তাকরার করার মতোই। ওই ব্যক্তি কমই সফল হয়েছে, যে উস্তাদের দরসে শোনা বিষয় পরে আর মুজাকারা করেনি।

সাত. দরসের মজলিস কায়েম হওয়ার পর সকলকে সালাম প্রদান করবে এবং উস্তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান ও তাজিম প্রকাশ করবে। উস্তাদের কাছে পৌঁছার জন্য অন্যদের ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। বরং যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসে যাবে। হাদীছে এভাবেই আমল করতে বলা হয়েছে। অবশ্য উস্তাদ যদি আদেশ করেন কিংবা তার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা থাকে অথবা অন্যরা তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে যেতে বলে তবে সেটা ভিন্ন কথা। আর

উস্তাদের কাছাকাছি বসার ব্যাপারে অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেবে না। হ্যাঁ, মর্যাদা, সম্মান, বয়স, বুযুর্গী ইত্যাদি কারণ থাকলে সেটা করতে পারে। ছাত্র অধিক হলে উচিত হচ্ছে সবাই উস্তাদ বরাবর সামনে বসা। যাতে উস্তাদের দৃষ্টি সবার দিকে নিবদ্ধ করা সহজ হয়।

আট. উস্তাদের মজলিসে উপস্থিত অন্যদেরকে সম্মান করবে। কেননা এটাও উস্তাদকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। মজলিসের দুইজনের মাঝখানে অনুমতি ছাড়া বসবে না। অনুমতি দিয়ে জায়গা খালি করে দিলে জমে বসে যাবে। আর নিজেও অন্যকে সুযোগ করে দেয়ার চেষ্টা করবে।

মজলিসে উপস্থিত লোকদের আরো কর্তব্য হচ্ছে, আগত ব্যক্তিকে মারহাবা বলা এবং তার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা। দরসের মধ্যে কোনো কথা বলার ইচ্ছা জাগলেও নীরবতার লাগাম দ্বারা তা থামিয়ে রাখা। দরসে কোনো ছাত্র খারাপ ব্যবহার করলে তাকে উস্তাদ বৈ নিজে শাসন না করা।

নয়. যা বুঝে আসেনি সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ না করা। তবে বুঝার জন্য মার্জিত ও ভদ্রভাষায় জিজ্ঞেস করা। বলা হয়ে থাকে-

من رقّ وجهه عند السؤال، ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.

‘যে ব্যক্তি কিছু জানার সময় চেহারা সংকুচিত করে জনসমাগমে তার নিচুতা ধরা পড়ে।’

দরসে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করবে না এবং উস্তাদ জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকলে পীড়াপীড়ি করবে না। আর উস্তাদ ভুল জবাব দিলে তখন তা প্রকাশ করবে না। বরং পরে সুযোগমতো একাকী বলবে। ছাত্রদের জন্য যেমন সওয়াল করা দোষের নয়, তেমনিভাবে উস্তাদ জিজ্ঞেস করলে 'বুঝিনি' বলাও দোষের নয়। কেননা এতে বর্তমান-ভবিষ্যত উভয় রকমের উপকারিতা রয়েছে। নগদ উপকারিতা হচ্ছে মাসআলা হল হওয়া এবং উস্তাদের আস্থা অর্জন করা। আর ভবিষ্যতের উপকারিতা হচ্ছে মিথ্যা ও কপটতা থেকে হেফাজত থাকা।

দশ. নিজের হকের রেয়ায়াত করবে এবং হকদারের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তাতে অগ্রসর হবে না। অবশ্য খতীব বাগদাদী বলেন, অগ্রাধিকার প্রাপকের জন্য অপরিচিতকে সুযোগ দেওয়া মুস্তাহাব। আর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পেশাব-পায়খানা, অজু ইত্যাদি জরুরতের কারণে বাইরে গেলে এতে তার হক রহিত হবে না।

এগার. কিতাবাদী নিয়ে উস্তাদের সামনে তাজিমের সঙ্গে বসবে এবং তার অনুমতি পাওয়ার পর পাঠ করতে শুরু করবে। পাঠ বা অন্য সময় কিতাবকে অশোভনীয় ও এলোমেলোভাবে কিংবা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখবে না।

বার. যখন নিজের পড়ার পালা আসবে তখন উস্তাদের অনুমতিক্রমে পাঠ করা শুরু করবে এবং প্রথমে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ

করবে। অতপর উস্তাদ, তার মাশায়েখ এবং পিতামাতা, নিজের এবং সকল মুসলিমের জন্য দু'আ করবে। প্রত্যেক দরস, মুতালাআ. তাকরার এবং মুজাকারার সময় এরূপ আমল করবে। উস্তাদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় দু'আ করবে এবং উস্তাদের জন্য দু'আয় বলবে-

ورضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامنا

'আল্লাহ আপনাদের ওপর, আমাদের শায়খ ও গুরুর ওপর সন্তুষ্ট হোন।' ছাত্র যেমন উস্তাদের জন্য দু'আ করবে উস্তাদও তেমনিভাবে ছাত্রের জন্য দু'আ করবে। আর ছাত্র যদি উল্লিখিত নিয়মে পাঠ শুরু করতে ভুলে যায় তবে উস্তাদ সুন্দরভাবে তা বুঝিয়ে দেবেন। কেননা এটাই নিয়ম।

তেরো. দরসের অন্য ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করবে। তাদের পেরেশানি ও হতাশা-নিরাশা দূর করার চেষ্টা করবে। তার যে ফায়েদা হাসিল হয়েছে অন্যদেরকেও তাতে শরিক করবে। দীনের ব্যাপারে তাদেরকে নসিহত করবে। এর দ্বারা তাদের ক্বলব আলোকিত হবে, আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। কিন্তু কখনই নিজের ইলমের জন্য ফখর কিংবা অন্যকে ছোট ভাববে না। বরং এরজন্য সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকরিয়া জানাবে।

সপ্তম পর্ব:

ইলমের মাধ্যম কিতাবাদীর সঙ্গে আচরণ

এক. ছাত্রদের উচিত হচ্ছে ইলম হাসিলের মাধ্যম জরুরীকিতাবগুলো ক্রয় করে পাঠ করা। তবে শুধু কিতাব সংগ্রহ করাকে ‘ইলম হাসিল হয়ে গেল’ বলে মনে করবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন,

إذا لم تكن حافظاً واعياً، فجمعك للكتب لا ينفع

‘তুমি যদি নিজে সংরক্ষণকারীই না হও, তবে সংগ্রহকৃত কিতাব তোমার উপকারে আসবে না।’

কিতাব কেনা সম্ভব হলে দরসের আলোচ্য বিষয় লিখে নেয়ার দরকার নেই। অপরাগতা ছাড়া সর্বদা এই লিখে নেয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা কাম্য নয়। ক্রয় বা ইজারা নেয়ার সুযোগ থাকা অবস্থায় কিতাব ধার নেয়ার চেষ্টা করবে না। কিতাব লিখতে হস্তাক্ষর সুন্দর করার চেষ্টা করবে বটে, তবে সুন্দর হস্তাক্ষরের চেয়ে বিশুদ্ধ করার প্রতি নজর বেশি দেবে।

দুই. ক্ষতি করার আশঙ্কা না থাকলে কাউকে কিতাব ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কেননা কিতাব ধার দেয়াও ইলমের সহযোগিতা করার শামিল। অথচ সাধারণ বস্তু ধার দেয়াতেই অনেক ফযীলত রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি বিখ্যাত মনীষী আবূল আতাহিয়াকে বললেন, ‘আমাকে আপনার কিতাব ধার দিন। জবাবে তিনি বললেন,

আমি কিতাব ধার দেওয়া অপছন্দ করি। তখন ওই লোকটি বললেন, আপনি কি জানেন না যে, সম্পর্ক বজায় থাকে অপ্রিয়তার মধ্য দিয়েই? তার কথা শুনে তিনি তাকে কিতাব ধার দিলেন।'

আর ধারগ্রহীতার উচিত হচ্ছে ধারদাতার শোকরিয়া আদায় ও কিতাবের হেফাজত করা। প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘ সময় নিজের কাছে ওই কিতাব না রাখা। ধার নেওয়া কিতাবে কোনো কিছু না লেখা। মালিকের অনুমতি ছাড়া তাতে কোনো কিছু সংযোজন না করা এবং তা তৃতীয় কাউকে না দেয়া। তবে কিতাব যদি অনির্দিষ্টভাবে ওয়াকফের হয় তবে সতর্কতার সঙ্গে তাতে কিছু যোগ করা বা যোগ্যতার শর্তে তাতে ভুল থাকলে সংশোধন করার অবকাশ আছে। জনৈক ব্যক্তি বুঝি কিতাব ধার দিয়ে ভোগান্তিতে পড়েই নিম্নোক্ত কবিতাটি বলেছিলেন!

أيها المستعير مني كتاباً ... ارض لي فيه ما لنفسك ترضى

'হে আমার কিতাবগ্রহীতা! এতে আমার ব্যাপারে তাই পছন্দ করো যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো!

তিন. পাঠ বা লেখার সময় কিতাব ভূমিতে ছড়িয়ে রাখবে না। বরং বেঞ্চ বা কিতাব রাখার সাধারণ স্থানে রাখবে। যাতে কিতাব হেফাজতে থাকে এবং মলাট দ্রুত খুলে না যায়। ভূমি থেকে উঁচু ও শুষ্কস্থানে কিতাব রাখবে, যাতে তা ভিজে না যায়। তাকের ওপর কিতাব রাখার সময় মর্যাদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রাখবে। অতএব কুরআন মাজীদ হলে তা সবার ওপরে রাখবে। আর উচিত

হচ্ছে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন তাকে কুরআন মাজীদ রাখা। অতপর ধারাবাহিকভাবে নিরেট হাদীছ, তাফসীর, উসুলে দীন, উসুলে ফিকহ, ফিকহ, নাহব, সরফ, আরবী শের ইত্যাদি কিতাব রাখা। যদি দুটি কিতাব শাস্ত্রীয় মর্যাদায় সমান হয় তবে যাতে কুরআনের আয়াত বা হাদীছ বেশি সেটা ওপরে রাখা। যদি তাতেও সমান হয় তবে মুসান্নিফের মর্যাদা অনুসারে ওপরে-নিচে রাখা। যদি এতেও দুইজন সমান সমান হন তবে সংকলনে যিনি অগ্রগামী এবং মানুষের হাতে যার কিতাব বেশি সেটা ওপরে রাখা। কিতাবের নাম শেষ পৃষ্ঠায় নিচে লিখবে, যাতে অনেকগুলোর মধ্যে থেকে তা বের করা সহজ হয়। সাবধান! কিতাবকে কখনও পাখার কাজে ব্যবহার করবে না, এর সঙ্গে হেলান দেবে না এবং এর দ্বারা মশা, মাছি মারবে না বা তাড়াবে না কিংবা এর ওপর মশা বসলে সেখানেই মশা মেরে ফেলবে না।

চার. কারো কাছ থেকে কিতাব ধার নিলে যথাযথ অবস্থায় ফেরত দেবে। ভাজ করা, দাগ কাটা, অপ্রাসাঙ্গিক কিছু লেখা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকবে।

পাঁচ. শরঈ ইলমের কোনো কিতাব লিখলে শরীর, কাপড় ও মনের পবিত্রতা নিয়ে কিবলামুখী হয়ে বসবে। যে কোনো কিতাব - بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা শুরু করবে। কিতাবের ভূমিকা হলে এর সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার হামদ এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদও যুক্ত করবে। এরপর কিতাবের মূল বিষয়

লিখবে। লিখনীর মধ্যে যতবার আল্লাহ তা‘আলার নাম আসবে ততবার তাজিমসূচক কোনো শব্দ যুক্ত করবে। যেমন, তা‘আলা, সুবহানাহু, আয্যা ওয়া জাল্লা, তাকাদ্দাসা ইত্যাদি। আর যতবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসবে ততবার সালাত ও সালাম পাঠ করবে।

বুযুর্গানে কেরাম সালাত ও সালাম উভয়টি পাঠ করতেন এবং এর সঙ্গে তাঁর পরিবার-পরিজনকেও শামিল করে এভাবে বলতেন,

صلى الله عليه وعلى آله وسلم

যদি বারবারও লেখার প্রয়োজন পড়ে তবু দরূদের কোনো বাক্য সংক্ষিপ্ত করবে না। যেমন, (সা.), (দ.) (আ.) কিংবা আরবীতে লিখলে, صلع، أو صلم، أو صلم،

এসব সংকীর্ণতা ও কৃপণতা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাহাবায়ে কেরামের নাম আসলে রাদিয়াল্লাহ তা‘আলা আনহু, পুণ্যবান পুর্বসুরী ও নেককার ব্যক্তিত্বগণের নাম আসলে রাহিমাহুল্লাহ তা‘আলা লিখবে।

ছয়. অতি সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট হস্তাক্ষরে কোনো কিছু লিখবে না। বুযুর্গানে কেরাম বলেন, তুমি সেটাই লিখ, প্রয়োজনের সময় যা তোমার কাজে দেয়। তা লিখ না, প্রয়োজনের সময় যা তোমাকে কাজে দেয় না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শেষ বয়স ও বার্ধক্যকাল।

অনেকে নানা কারণে সংক্ষেপ ও ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, বার্ধক্যের সময় ক্ষুদ্রলেখা পাঠ করতে সমস্যা হবে।

সাত. নিজের লেখা বা কিতাবের কোনো বিষয় উস্তাদ বা অন্য কোনো কিতাবের সাহায্যে সহীহ-শুদ্ধ করে নেয়ার সময় হরকত দিয়ে আলামতযুক্ত করে রাখবে। ভুলের স্থানও চিহ্নিত করে রাখবে। শুদ্ধ ও সংস্কার করে নেয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করার রীতি আছে সেগুলো ব্যবহার করবে।

আট. লেখার শিরোনাম, উপশিরোনাম, অধ্যায়, পর্ব, ভূমিকা, উপসংহার ইত্যাদি লাল বা মোটা হরফে লেখাতে দোষ নেই। কেননা এভাবে পাঠোদ্ধার সহজ হয়। এমনিভাবে মাযহাব, ইমামের নাম, তাদের বক্তব্য, অভিধান, সংখ্যা ইত্যাদি ভিন্ন কালিতে লেখা যেতে পারে। কিতাবে কোনো বিষয় নতুন যুক্ত করলে কিংবা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করলে শুরুতে পাঠককে সে ব্যাপারে অভিহিত করবে। যাতে প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা সহজ হয়।

নয়. কোনো কিছু মুছে ফেলার দরকার হলে লেখার ওপরে দাগ টেনে দেবে। খুটিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করবে না। বলা হয়ে থাকে- الضرب أولى من الحك

লেখাপড়া, আমল-আখলাক, চাল-চলন, কাজকর্ম সবকিছুতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ফকীহ, মুহাদ্দিসীন, মুসান্নিফ, মুআল্লিফ, রাহবার, শায়খ-উস্তাদ প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদান

করবে। তাদের আন্তরিক দোয়াকে নিজের জীবনের সফলতা লাভের সিঁড়ি বলে মনে করবে।

শিশুদের প্রতি অবশ্যই সহমর্মী ও কোমল হতে হবে

মানুষের স্বভাব কোমলতাপ্রিয়। শিশু ও কিশোর বয়সে স্বভাব তো আরো বেশি কোমল থাকে। এই সময় শিশু ও কিশোররা প্রতিটি বস্তু কোমলভাবে পেতে চায়। আর এটাই বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব গড়েছেন। তাই উস্তাদগণকে সর্বদা এই ফিতরী স্বভাবের প্রতি খেয়াল করতে হবে। আল্লাহ তা'আলাও তো বান্দার ওপর কঠিন কোনো কাজ চাপিয়ে দেননি। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

'আল্লাহ বান্দার জন্য দুঃসাধ্য কোনো কিছু আরোপ করেন নি।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬}

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা চান না।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}

সুতরাং শিশু-কিশোরদের প্রতি কঠোরতা করা বাঞ্ছনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর প্রতি সীমাহীন করুণাকামী ও কোমল ছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا »

'যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের অধিকার সম্পর্কে জানে না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।' [মু'জামুল কাবীর: ৮১৫৪]

সুতরাং শিশুদের মনে ক্লান্তি সৃষ্টি করে এধরনের কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাদেরকে স্নেহশীলতার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি সর্বদা মাথায় রাখা চাই।

পরিশিষ্ট: বিবিধ প্রসঙ্গ

আলেমগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামর্থ থাকার প্রয়োজনীয়তা

আলেমগণ হালাল-হারাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই হালাল-হারাম মেনে চলার দায়িত্বও তাদের বেশি। হালাল-হারামের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় জীবিকার ক্ষেত্রে। তাই জীবিকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হালালপন্থা অবলম্বন করা এবং হারাম ও সন্দেহজনকপন্থা থেকে দূরে রাখা পবিত্র দায়িত্ব। কোনো কোনো হাদীছে হালাল উপার্জনকে অন্যতম ফরয বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য হাদীছে ব্যবসা এবং হাতের কামাইকে সর্বোত্তম উপার্জন আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন-

أفضلُ الكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

'মানুষের সর্বোত্তম উপার্জন হলো বৈধ ব্যবসা এবং হাতের কাজের উপার্জন।' [ছহীহুল জামে': ১১২৬, সহীহ]

শেষ জমানায় হারামের ছড়াছড়ি এবং হালাল উপার্জনের ঘাটতি দেখা দেবে বলে হাদীছে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং গোটা উম্মতের এই ক্রান্তিলগ্নে অন্তত আলেমকে যে কোনো মূল্যে হারাম থেকে বাঁচা এবং হালালপন্থা আকড়ে ধরে রাখা একান্ত কর্তব্য। শেষ জমানায় দীন সাপের গুহায় প্রবেশের ন্যায় মদীনার দিকে বিদায় নিতে থাকবে। ওই দুর্যোগের সময়েও আলেমগণ সহীহ

দীন ধরে রাখবেন এটাই একান্ত কাম্য। আর এই প্রচেষ্টা নবীদেরই পবিত্র আখলাকের অন্যতম অংশ। যেমন, হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

أُمِرَتِ الرُّسُلُ أَنْ لا تَأْكُلَ إلاَّ طَيِّباً ولا تَعْمَلَ إلاَّ صالِحاً

'রাসূলগণকে একমাত্র হালাল ভক্ষণ এবং একমাত্র নেক কাজের আদেশ করা হয়েছে।' [ছহীহুল জামে': ১৩৬৭, হাসান]

আল্লাহ তা'আলা অলস লোক পছন্দ করেন না। বস্তুত হালাল উপার্জনে সাধারণ পেশা অবলম্বন করা আদৌ দোষের বিষয় নয়। স্বয়ং নবী-রাসূলগণও সাধারণ পেশা অবলম্বন করতে লজ্জাবোধ করতেন না। আল্লাহর নবী মূসা (আ.) কায়িক শ্রম করেছেন। আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও শারীরিক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন।

আর বিশেষ করে আলেমদের জন্য হালাল রুজির স্বল্পতায় বিচলিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনো ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট রিজিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না।

অবৈধ বা সন্দেহজনকপন্থা পরিহার করে হালাল রুজির পন্থা অবলম্বন করাই একজন আলেমের বড় শান। হাদীছে এ ধরনের সাহসী লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

التَّاجِرُ الجَبانُ مَحْرُومٌ والتَّاجِرُ الجَسُورُ مَرْزُوقٌ

'ভীরু ব্যবসায়ী বঞ্চিত এবং সাহসী ব্যবসায়ী রিজিকপ্রাপ্ত হয়।' [জামে ছগীর: ৩৩৯৫, হাসান]

দীনী খেদমতের পাশাপাশি যদি বৈধ কোনো ব্যবসার সুযোগ এসে যায়, তবে তা হাতছাড়া করা ঠিক নয়। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাও অপছন্দ করেন। অন্যের কাছে হাত পাতার চেয়ে নিজে যে কোনো হালাল পন্থায় উপার্জন করা উচিত। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ»

‘ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উচু হাত নিচু হাত থেকে উত্তম। খরচকারী হাত হলো উচু হাত আর নিচু হাত হলো প্রার্থনাকারী হাত।’ [মুসলিম: ১০৩৩]

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন,

المال سلاح المؤمن في هذا الزمان

‘এই যুগে মুমিনের সম্পদ আত্মরক্ষাকারী অস্ত্রের মতো অপরিহার্য।’

পুত্রকে খালেদ ইবন সাফওয়ানের উপদেশ-

يا بني أوصيك باثنتين لن تزال بخير ما تمسكت بهما درهمك لمعاشك ودينك لمعادك

‘হে বৎস! আমি তোমাকে দুটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তা ধারণ ও লালন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

যথা, দিরহাম রাখবে দুনিয়ার জন্য আর দীনকে রাখবে আখেরাতের জন্য।'

বিদ্বানগণ বলেন,

لا خير فيمن لا يجمع المال يصونُ به عرضَه، ويحمي به مروءتَه ويصل به رحِمَه

'ওই ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ নেই, যে নিজের সম্ভ্রম ও আভিজাত্য রক্ষা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার জন্য মাল-সম্পদ সঞ্চয় করে না।'

সর্বোপরি শক্তিশালী মুমিনকে হাদীছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزْ

'শক্তিশালী মুমিন উত্তম ও আল্লাহর কাছে প্রিয়, দুর্বল মুমিনের চেয়ে। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ এবং যা তোমার জন্য কল্যাণকর তা হাসিল করো, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অপারগ হয়ো না।' [মুসলিম: ২৬৬৪]

ছাত্রদের পরীক্ষার সময় করণীয়

পরীক্ষা ছাত্রজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। সারাবছরের শ্রম ও মেহনতের ফসল তোলা হয় পরীক্ষার বোঝা বহন করে। তাই পরীক্ষা ছাত্রজীবনের যেমন গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ তেমনিভাবে সফলতা লাভেরও দ্বার। এজন্যই বলা হয়-

عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان

‘পরীক্ষার সময় কেউ সম্মানীত এবং কেউ লাঞ্ছিত হয়।’

তবে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য বিশেষ কিছু করণীয় রয়েছে। সেগুলো অবলম্বন করলে আশা করা যায় আশাতীত সাফল্য লাভ করা যাবে। নিম্নে সেসব বিষয় তুলে ধরা হলো।

পরীক্ষায় সাফল্য লাভে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে-পরে অব্যাহতভাবে দু‘আ করা এবং আল্লাহ তা‘আলার দিকে মনোনিবেশ। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছু হয় না। তাই পরীক্ষার সাফল্য লাভে তারই দিকে মনোনিবেশ করা। আর দু‘আ যে কোনো শরঈ শব্দ দ্বারা হতে পারে। যেমন-

﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ۝٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ۝٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ۝٢٧ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى ۝٢٨ ﴾ [طه: ٢٥، ٢٨]

‘হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন।যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।’ {সূরা ত-হা, আয়াত: ২৫-২৮}

পরীক্ষার দিনের করণীয় হচ্ছে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা এবং নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষার হলে যাওয়া। হলে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু সঙ্গে রাখবে। যেমন, কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, ঘড়ি এবং প্রয়োজনীয় ও পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য আসবাবপত্র। কেননা উত্তম প্রস্তুতি উত্তম জবাব প্রদানে সহায়ক। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বের হওয়ার দু‘আর কথা তো বলাই বাহুল্য। যথা-

عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ -يَعْني: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ -: بِسمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ، يُقالُ لَهُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيطَانُ»رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وَقالَ الترمذي: «حديث حسن»، زاد أبو داود: «فَيَقُولُ - يَعنِي: اَلشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ آخَر: كَيفَ لَكَ بِرجلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟»

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা ক্কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়,

তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল। আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। [আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ]

তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ এই শব্দগুলি বাড়তি বর্ণনা করেছেন, ফলে শয়তান অন্য শয়তানকে বলে যে, ওই ব্যক্তির ওপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে (সকল অমঙ্গল) থেকে বাঁচানো হয়েছে? [তিরমিযী: ৩৪২৬; আবূ দাউদ: ৫০৯৫]

পরীক্ষা শুরু করার আগে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলবে। কেননা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলা জরুরীএবং তা বরকত লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পাওয়ার উপায় এবং তাওফীক প্রাপ্তির মহা নিয়ামক।

পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে এবং পরীক্ষার পড়াশোনার সময় সাথী-সঙ্গীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। তাদেরকে আশান্বিত করবে এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতাশাগ্রস্থ করবে না। বরং তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করবে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে ও বিভিন্নভাবে শুভ লক্ষণ বুঝাবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রাণিত করতেন এবং শুভ লক্ষণ দিতেন। যেমন, সুহাইল

নামের শুভ লক্ষণ নিতেন ‘সব কাজ সহজ হয়ে যাওয়া বলে।’ আর তিনি ঘর হতে বের হওয়ার সময়-

يا راشد يا نجيح

‘হে রাশেদ, হে সফলকাম।’ এ ধরনের বাক্য শুনতে পছন্দ করতেন। কেননা রাশেদ শব্দের অর্থ হচ্ছে পথপ্রাপ্ত আর নাজিহ শব্দের অর্থ মুক্তিপ্রাপ্ত।

অতএব, ছাত্ররা নিজে এবং অন্যদের জন্য শুভলক্ষণ নেবে এবং সঙ্গীদেরকে বলবে, ‘অবশ্যই তুমি পরীক্ষায় সফল ও কামিয়াব হবে।’

আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ পেরেশানি দূর করার অব্যর্থ ওষুধ। সুতরাং যখনই কোনো পেরেশানিতে পড়বে কিংবা কোনো প্রশ্নের জবাবের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়বে তখনই দুয়েকবার আল্লাহ তা‘আলার নাম স্মরণ করবে এবং তাঁর কাছে দু‘আ করবে, যাতে তিনি উপস্থিত সমস্যার সমাধান করে দেন।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) কোনো বিষয়ে অবোধগম্যতার সম্মুখীন হলে এবং কোনো বিষয় সহজে বুঝে না আসলে এরূপ দু‘আ করতেন,

يا معلّم ابراهيم علمني ويا مفهّم سليمان فهمني.

‘হে ইবরাহীমের শিক্ষক আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন এবং হে সুলায়মানকে বুঝিয়েদাতা আমাকে বুঝিয়ে দিন।’

আপনিও পরীক্ষার হলে কিংবা মুতা'আলার সময় এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে উল্লিখিত দু'আটি পাঠ করতে পারেন। আশা করা যায় ভালো ফল পাওয়া যাবে।

পড়াশোনার জন্য ভালো স্থান নির্বাচন করুন এবং পরীক্ষার হলেও মাদরাসার পক্ষ থেকে সিট নির্দিষ্ট না করা হলে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরিবিলি স্থানে আপনার বসার স্থান নির্ধারণ করুন। আর নির্দিষ্ট করা থাকলে সেখানে সুন্দরভাবে, সুন্নাত তরিকায় উপবেশন করুন।

প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পূর্ণ সময়কে আপনি ভাগ করে ফেলুন এবং মোট সময়ের অন্তত দশ ভাগ সময় গভীরভাবে ও মনোযোগসহকারে প্রশ্ন পাঠের জন্য নির্ধারণ করুন। এরপর প্রশ্নের পরিস্থিতি অনুযায়ী আবশ্যকীয় জবাব লেখার জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করুন এবং প্রতিটি জবাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

প্রশ্ন পাঠ করে প্রতিটি প্রশ্নের চাওয়া জবাবের মূল অংশ কোনটি-সেটা চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, প্রতিটি প্রশ্নে চাওয়ার একটা মূল জায়গা থাকে। সেই অংশটুকু যদি সুন্দর করে লেখা যায় তবে ওই প্রশ্নের অন্য আনুষঙ্গিক অংশে ঘাটতি থাকলেও তাতে তেমন প্রভাব ফেলে না। পক্ষান্তরে প্রশ্নে চাওয়া বিষয়ের বাইরে গিয়ে অনেক কিছু লিখলেও নাম্বার পাওয়ার ক্ষেত্রে তা তেমন কাজে দেয় না।

লেখা শুরু করার আগে অপেক্ষাকৃত সহজগুলো দাগ দিয়ে চিহ্নিত করুন এবং সেগুলোই আগে লেখা শুরু করুন। জবাব শুরু করার আগে কোন্ প্রশ্নে মৌলিকভাবে কী বিষয় উপস্থাপন করতে হবে পারলে তাও চিহ্নিত করে নিন।

এরপর যে জবাব সবচেয়ে বেশি ভালো জানা আছে, আল্লাহ তা‘আলার নাম নিয়ে সেই জবাব আগে শুরু করুন এবং ধারাবাহিকভাবে এই নিয়মই বজায় রাখুন এবং সর্বশেষে লেখার তালিকায় রাখুন সেই জবাব, যে ব্যাপারে আপনার জানাশোনা তুলনামূলক কম এবং সে ব্যাপারে আপনি সন্দিহান।

জবাব লেখার সময় সাবলীলতার সঙ্গে ধীর-স্থীরতা অবলম্বন করুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজে এমন পন্থাই অবলম্বন করতেন। তিনি ইরশাদ করেন-

«التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»

‘ধীরস্থীরতা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।’ [বাইহাকী: ৪০৫৮; হাসান, আলবানী, সিলসিলা সহীহা: ১৭৯৫]

সঠিক উত্তর নির্ণয়ের যে প্রশ্ন থাকে (যেমন, বলা থাকে, সঠিক উত্তরের পাশে (টিক) চিহ্ন দাও) সেসব প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়ের জন্য বারবার ফিকির করতে হবে এবং ফিকির করার পর সহীহ জবাবের ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি হলে ওয়াসওয়া ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব মন থেকে তাড়িয়ে দেবে। আর কোনো বিষয়ে দৃঢ়তা পয়দা না হলে সম্ভাব্য

জবাবগুলোর মধ্য থেকে সহীহ জবাব খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করবে এবং প্রবল ধারণা অনুযায়ী যেটাকে সহীহ জবাব বলে মনে হবে সেটাকে চিহ্নিত করবে।

আর কোনো জবাবকে সহীহ বলে চিহ্নিত করার পর শুধু দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে সেটাকে কেটে দেবে না। হ্যাঁ, যদি অন্যটা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা এবং আগেরটা ভুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা।

লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে জবাব লেখা শুরুর আগে জেহেনকে স্থীর ও মনোযোগী করে নেবে। সম্ভব হলে কিছু হরফ দিয়ে ইশারা করে রাখবে, যাতে জবাবের কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত থাকবে। জবাবের প্রধান ও মূল অংশ শুরুতে লিপিবদ্ধ করবে। এর দ্বারা পরীক্ষকের আস্থা তৈরি হয় এবং ছাত্রটি জবাবের গভীরে পৌঁছতে পেরেছে বলে উস্তাদ বিশ্বাস করেন। ফলে এতে যথাযথ নাম্বার পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

প্রশ্নপত্রে নজরে ছানী বা পুনরায় দেখার জন্য অবশ্যই কিছু সময় নির্দিষ্ট করবে এবং তা শতকরা হারেও হতে পারে। আর নজরে ছানী অবশ্যই ধীরেসুস্থে হতে হবে এবং এখানে কোনোক্রমেই তাড়াহুড়া করা যাবে না। বিশেষ করে যদি অংক পরীক্ষা কিংবা হিসাব জাতীয় পরীক্ষা হয়। যেমন, মিরাছের সিরাজী কিংবা এধরনের কোনো পরীক্ষা।

প্রশ্নপত্র জমা দেয়ার ব্যাপারে কখনই তাড়াহুড়ো করবে না এবং যারা তাড়াহুড়ো করে খাতা দিয়ে হল থেকে বের হয়ে যায় তাদের দ্বারা উৎসাহিত হবে না। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার হলে একদল ছাত্র এমন থাকবেই, যারা দ্রুত হল থেকে বের হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। সুতরাং কখনই তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না।

পরীক্ষার পর কোনো উত্তরপত্রে ভুল ধরা পড়লে তাতে বিমর্ষ না হয়ে পরবর্তী পরীক্ষা ভালো করার জন্য মনোযোগী হবে এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে তাড়াপ্রবণ না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। সর্বোপরী আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার ওপর তুষ্ট থাকবে এবং এই বিশ্বাস নেবে যে, তার ইশারা ছাড়া কলম নড়ে না। অতএব ভুল যা হওয়ার তা এড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই সামনে যাতে ভুল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে আরো ভালো প্রস্তুতি নেবে। আরো মনে রাখবে যে, ভুলের জন্য হা-পিত্যেস করলে কেবল কষ্টই বাড়বে, কোনো ফল হবে না। এক্ষেত্রে হাদীছের কথা স্মরণ করবে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَـٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»

'কোনো কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে এমন বলো না, 'যদি এরূপ করতাম তবে এরূপ হতো'। বরং এরূপ বলো, যা হওয়ার তা

আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালায় হয়েছে। কেননা, ‘যদি’ বলা শয়তানের পথ খুলে দেয়।’ [সহীহ মুসলিম: ২৬৬৪]

মনে রাখবে ধোঁকাবাজি সর্বাবস্থায় হারাম। চাই তা যে ভাষারই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»

‘যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ [মুসলিম: ১০২; তিরমিযী: ১৩১৫]

সুতরাং পরীক্ষার হলে অবৈধ উপায়ে নাম্বার লাভ করা এবং এর ভিত্তিতে সনদ কিংবা ক্লাসের মর্যাদা লাভ করা জুলুম এবং হারামপন্থা বলে বিবেচিত হবে। ধোঁকাবাজীর সংজ্ঞার ব্যাপারে সবাই একমত যে, এটা হচ্ছে পাপ ও অনৈতিক কাজে সহযোগিতা করা। অতএব হারাম থেকে বেঁচে থাকবে। তবে আল্লাহ তা‘আলা নিজের পক্ষ থেকে রহম ও অনুগ্রহের ফয়সালা করবেন। তাই অবৈধ যাবতীয় পন্থা পরিহার করে চলবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য কোনো বস্তু তরক করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করেন। শুধু নিজেই অন্যায় ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবে না বরং কাউকে এরূপ করতে দেখলে তা রোধ করার চেষ্টা করবে এবং উস্তাদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এটা গীবত কিংবা চোগলখোরির অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং মন্দকাজে বাধা দেয়ার মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং কেউ ইন্টারনেট কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করতে চাইলে তাকে বাধা দেবে এবং

এই কাজের পাপের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আজকাল শিক্ষার্থীরা অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে যে পরিমাণ সময় ও অর্থ ব্যয় করে সেই পরিমাণ সময় ও অর্থ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করলে অনেক ভালো ও ফলদায়ক হতো এবং এভাবে নিন্দনীয় পথে গিয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রয়োজন হতো না।

আর দুনিয়ার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের পরীক্ষা এবং আখেরাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যা প্রস্তুত করে রেখেছেন সে কথা মনে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া দরস কায়েম না করা

ইলমের সূত্র গভীরে প্রোথিত। বাহ্যিক কিছু হরফ বা অক্ষরজ্ঞানকে অন্য যে পরিভাষাতে হোক অন্তত ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় ইলম বলা যায় না। ইলমে দীনের সঙ্গে রূহানীয়াতের সম্পর্ক গভীরে। এই রূহানীয়াতের অন্যতম দিক হলো 'সিনা ব সিনা' তথা উস্তাদ পরম্পরায় এবং উস্তাদের নেক দু'আ ও পরামর্শ নিয়ে ইলমী খেদমতে নিয়োজিত হওয়া। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন পদক্ষেপ নিলে উস্তাদের দু'আ ও পরামর্ম সাপেক্ষে তা করা। উস্তাদ ও রূহানী মুরুব্বীর পরামর্শ ছাড়া বড় ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে অনেক সময় ব্যর্থতা সঙ্গী হয় এবং গৃহীত পদক্ষেপ মুখ থুবড়ে পড়ে। একারণে শফীক উস্তাদের পরামর্শ ও দু'আ নিয়ে যে কোনো শুরু করা দরকার। এসম্পর্কে আমরা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর বিখ্যাত সেই ঘটনাটি উল্লেখ করতে পারি। ঘটনা মানাকেবে কারদারিতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) একবার মারাত্মক রোগাক্রান্ত হলেন। স্নেহের এই শিষ্যকে দেখতে স্বয়ং তার ঘরে আসলেন ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.)। বিভিন্ন কথাবার্তার পর তিনি তাকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি আমার পর তোমাকে মুসলিম জাতির দায়িত্ব প্রদান করে যাবো। আর এখন যদি তোমার কিছু হয়ে যায় তবে ইলমের বিরাট অংশের মৃত্যু ঘটবে।

এরপর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং আত্মতুষ্টিতে নিজেই স্বতন্ত্র একটি দরসগাহ কায়েম করলেন। কথাটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অন্যের মাধ্যমে জানতে পারলেন। স্নেহের শিষ্যকে হাতে-কলমে ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। একজন আলেমকে ছয়টি মাসআলা শিখিয়ে তার কাছে পাঠালেন।

ওই ছাত্র উস্তাদের কৌশল অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-কে প্রশ্নগুলো করতে থাকলেন। কিন্তু সেটার সন্তোষজনক জবাব দিতে না পেরে তিনি লজ্জিত হলেন এবং দৌড়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাছে ছুটে এলেন। আবূ হানীফা (রহ.) তাকে দেখে বললেন, বুঝতে পারছি ওই মাসআলাগুলোই আমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। এরপর তিনি তার ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করলেন-

تزببت قبل أن تحصرم

‘ফল চয়ন করার আগেই কিসমিসে পরিণত হয়েছো!’ অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন করার আগেই দরস কায়েম করেছো!

রাত্রিজাগরণের সহায়ক ১০৩ উপায়

রাত্রিজাগরণ তলবে ইলমের শান। পূর্বসূরীগণগণের শিআর এবং আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু অলসতা, গাফলতি ও আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে আমরা ক্রমশ: রাত্রিজাগরণের এই গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ফলে বঞ্চিত হচ্ছি অমূল্য রত্নভাণ্ডার থেকে। রহমত থেকে এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ থেকে। অবশ্য আমরা মনেপ্রাণে প্রত্যেকেই চাই রাত্রিজাগরণ করতে। নিস্তব্ধ শেষরজনীতে জেগে প্রভুর দরবারে বিনম্রশ্রদ্ধায় দু'আর হাত উত্তোলন করতে। কিন্তু সব স্বপ্ন, রাত্রিজাগরণের পবিত্র আশা নিষ্ফল হয়ে যায় অলসতা এবং শয়তানের ধোঁকার কাছে। তবে কিছু পন্থা ও উপায় আছে যা অবলম্বন করতে পারলে তলবে ইলম ও আখেরাতপ্রত্যাশীদের জন্য রাত্রিজাগরণ করা সহজ হয়। নিম্নে এরূপ কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হলো।

১. রাত্রিজাগরণের ব্যাপারে পূর্ণ নিষ্ঠাবান হওয়া এবং সে অনুযায়ী যত্নবান হওয়া।

২. মনে একথার অনুভূতি সঞ্চারণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রে আমাকে আহ্বান করেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিজাগরণের জন্য আহ্বান করেছেন ও গুরুত্বারোপ করেছেন।

৪. পূর্বসূরীগণ রাত্রিজাগরণের মধ্যে ইবাদতের স্বাদ লাভ করেছেন- একথা স্মরণ করা।

৫. ডানপাশে শোয়া।

৬. এ কথার বিশ্বাস স্থাপন করা যে, রাত্রিজাগরণ অন্তর থেকে গাফলতি দূর করে।

৭. আল্লাহ তা‘আলা আমার রাতের সালাত বিশেষভাবে দেখেন- অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করা।

৮. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিজাগরণের জন্য কীরূপ কষ্ট করেছেন- তা মনের মধ্যে সজা জাগরুক রাখা।

৯. রাত্রিজাগরণকারীদের গুণাবলী অর্জনের তীব্র বাসনা থাকা।

১০. আল্লাহ তা‘আলা যেন রাত্রিজাগরণ সহজ করে দেন- সেটার জন্য দু‘আ করা।

১১. পবিত্র অবস্থায় রাত্রিযাপন করতে যাওয়া।

১২. রাত্রিজাগরণকারীদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্ট ও খুশি হন তা স্মরণে রাখা।

১৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড অসুস্থতার সময়েও তাহাজ্জুদ সালাত ত্যাগ করেননি- সে কথা সর্বদা মনে হাজির রাখা।

১৪. রাত্রিজাগরণে সাহাবায়ে কেরামের সাধনার কথা মনে রাখা।

১৫. ইশার পর দ্রুত ঘুমাতে যাওয়া।

১৬. তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার দ্বারা হুরে ঈন লাভ করা যায়- সে কথা মনে রাখা।

১৭. রাতে জাগার নিয়তে ঘুমাতে যাওয়া।

১৮. রাত্রিজাগরণ করলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে নিয়ে ফেরেস্তাদের সঙ্গে গর্ব করেন- একথা মনে রাখা।

১৯. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দানেও তাহাজ্জুদ ছাড়েননি- সে কথা মনে রাখা।

২০. গুনাহ ও পাপ থেকে বেঁচে থাকা।

২১. ঘুমের আগে সুন্নাত দু‘আ-ওজিফাগুলো আদায় করা।

২২. রাত্রিজাগরণ করার ফযীলতগুলো স্মরণে রাখা।

২৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরেও তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না- তা মনে রাখা।

২৪. নারী সাহাবীগণ রাত্রিজাগরণে খুব তৎপর ছিলেন তা মনে রাখা।

২৫. দিনের কিছু সময় কায়লূলা করা।

২৬. রাত্রিজাগরণ কলবের সৌভাগ্য এবং অন্তর খুলে যাওয়ার মাধ্যম তা অনুধাবন করা।

২৭. বেশি খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকা।

২৮. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে রাত্রিজাগরণে সদা সজাগ ছিলেন- তা মনে রাখা।

২৯. পূর্ববর্তী খলীফা ও আমীরগণ তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ে তৎপর ছিলেন- তা জানা।

৩০. শয়তান তাহাজ্জুদ সালাত থেকে মানুষকে বিরত রাখতে চায়- তা স্মরণ করা।

৩১. তাহাজ্জুদ সালাত জিহাদের ময়দানে আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য লাভে সহায়ক- একথা মনে রাখা।

৩২. কোনো কারণে রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে না পারলে দিনে তার কাজা করে নেয়ার প্রতিজ্ঞা রাখা।

৩৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাগণকে কীভাবে রাত্রিজাগরণে সচেষ্ট ছিলেন তা স্মরণে রাখা।

৩৪. রাত্রিজাগরণকারী আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে কথোকপথনকারী- একথা মনে রেখে ঘুমাতে যাওয়া।

৩৫. রাত্রিজাগরণ জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক- তা মনে রাখা।

৩৬. মাত্রাতিরিক্ত ঘুমানোর অভ্যাস পরিহার করা।

৩৭. রাত্রিজাগরণের প্রতি পূর্বসূরীগণগণের ওসিয়তের কথা স্মরণ করা।

৩৮. আত্মার পরিশুদ্ধি ও মুহাসাবার জন্য ঘুম তরক করার ব্যাপারে নিজেকে প্রস্তুত করা।

৩৯. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রাত্রিজাগরণের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করেছেন সে কথা মনে রাখা।

৪০. তাহাজ্জুদ সালাত জান্নাত লাভের উপায়, এই বিশ্বাস নিয়ে বিছানায় যাওয়া।

৪১. ঘুম কমিয়ে নফসের সঙ্গে মুজাহাদা করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৪২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মাছনূন দু‘আগুলো আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

৪৩. রাত্রিজাগরণ কিয়ামত দিবসে হিসেব সহজ হওয়ার মাধ্যম- একথা মনে রাখা।

৪৪. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে তাহাজ্জুদ সালাতে উপস্থিত দেখতে চাইতেন এবং তাদেরকে রাত্রিজাগরণে উদ্বুদ্ধ করতেন, সে কথা জানা।

৪৫. পূর্বসূরীগণ কোনোদিন তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারলে কীরূপ কষ্ট পেতেন এবং অনুশোচনায় কান্নাকাটি করতেন সে সব ঘটনাবলি জানা এবং নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হওয়া।

৪৬. তাহাজ্জুদ গুনাহ মাফের কারণ। তাই তাহাজ্জুদের মাধ্যমে গুনাহ মাফের ব্যবস্থা করা।

৪৭. হালাল রিজিক গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

৪৮. পরস্পরে তাহাজ্জুদ সালাতের ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা করা।

৪৯. পূর্বসূরীগণ নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে রাত্রিজাগরণে কীরূপ পন্থা অবলম্বন করতেন তা জানা এবং নিজেরাও সেরূপ আমল করতে সচেষ্ট হওয়া।

৫০. রাত্রিজাগরণই একজন মুমিনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এবং এতেই তার শ্রেষ্ঠত্ব সে কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং এই গুণ নিয়ে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করা।

৫১. তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি ওলামায়ে কেরামের আগ্রহ ও বাসনার অভিজ্ঞতা জানা এবং নিজেরাও সেরূপ আমল করা।

৫২. উচ্চমর্যাদা লাভের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ লাভ করা।

৫৩. এই বিশ্বাস রাখা যে, তাহাজ্জুদ সালাত আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী।

৫৪. জান্নাতের নেয়ামতের কথা স্মরণ করা।

৫৫. রাত্রিজাগরণ করার উদ্দেশ্যে ঘুম ছেড়ে ওঠার মুহূর্তে মুখমণ্ডলে পানি ছিঁটিয়ে দেয়া।

৫৬. তাহাজ্জুদ সালাত শেষ পরিণতি উত্তম হওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। শেষ পরিণতি সুন্দর হওয়ার বাসনায় তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হতে সচেষ্ট হওয়া।

৫৭. ওলী-বুযুর্গগণ স্ত্রী-সন্তানদের সান্নিধ্যের চেয়ে তাহাজ্জুদ সালাতে বেশি মজা ও স্বাদ লাভ করতেন। নিজেদের মধ্যেও সেই মজা ও স্বাদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়া।

৫৮. রাত্রিজাগরণে কসুর করায় নফসকে ভর্ৎসনা করা।

৫৯. জাহান্নামের আগুন, শাস্তি ও এর ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে ঘুমের তীব্রতা দূর করা এবং এভাবে তাহাজ্জুদ আদায়ে সহায়তা লাভ করা।

৬০. রাত্রিতে ওঠার পর মেসওয়াক করা।

৬১. তাহাজ্জুদ সালাতের পর দু'আ কবুল হয়। দু'আর মাধ্যমে নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য তাহাজ্জুদ সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

৬২. নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। তাই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৬৩. আগের যুগের নেককার নারীগণ তাদের স্বামীদেরকে বিভিন্ন কৌশলে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করতেন। তাদের সে সব কাহিনী

ঈমানী চেতনা জাগরুক এবং শিক্ষণীয়। সেসব ঘটনা পাঠ করে নিজেরা শিক্ষা লাভ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

৬৪. কুপ্রবৃত্তি দমন করা মুমিনের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে তাহাজ্জুদের ভূমিকা অনেক। তাই এই উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৬৫. তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার দ্বারা দীনের ওপর অবিচল থাকা যায়। তাই দীনের ওপর অবিচল থাকার দৃঢ়প্রত্যয়ে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৬৬. তাহাজ্জুদ সালাতের বদৌলতে দুনিয়াবিমুখতার গুণ হাসিল হয়। আর এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় গুণ। সুতরাং এই গুণ হাসিলের জন্য নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৬৭. মাঝেমধ্যে ডাকাডাকি ছাড়া জামাতের সঙ্গে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৬৮. তাহাজ্জুদ সালাতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভ হয়। আর জগতে এরচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আর কী হতে পারে? তাই এই সম্পদ লাভের জন্য তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৬৯. অধিক হাসাহাসি ও অনর্থক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা।

৭০. সালফে সালেহীন তাহাজ্জুদ সালাতে এত স্বাদ ও মজা পেতেন যে, কেবল এই স্বাদের জন্যই তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দীর্ঘ হায়াত কামনা করতেন।

৭১. আখিরাতের জীবনের প্রতি ধাবিত হওয়া।

৭২. তাহাজ্জুদ সালাতের বাহ্যিক ফায়েদা হচ্ছে; এর দ্বারা চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও কমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। তাই এই নেয়ামত লাভের স্বার্থে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৭৩. জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত করা এবং মৃত্যুর কথা বেশি বেশি মনে করা। এই গুণও তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত হওয়ার সহায়ক।

৭৪. তাহাজ্জুদ সালাত নিঃসন্দে কঠিন এক ইবাদত। কিন্তু এতে অভ্যস্ত হলে আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য ইবাদত করাও সহজ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধান সহজে পালনের সুবিধার্থে তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৭৫. স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যদেরকেও তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য জাগ্রত করা।

৭৬. তাহাজ্জুদ নামাযী কেয়ামত দিবসে তার সঙ্গীর জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করবে। এই সুবিধা লাভের জন্য তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৭৭. বুযুর্গানে কেরামও মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করার সময়েও তাহাজ্জুদের পাবন্দি করতেন। তাই তাদের অনুকরণে আমাদেরকেও অন্তত সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৭৮. আল্লাহ তা‘আলা ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি প্রতিযোগিতার অভ্যস্ত গড়ে তোলা এবং তাহাজ্জুদের মাধ্যমে সেই প্রতিযোগিতার অনুশীলন করা।

৭৯. রাত্রিজাগরণ সাধারণের মধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাই মানুষের মধ্যে দীনী প্রভাব বিস্তার করার স্বার্থে তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৮০. কবরজগত এবং এর ভয়াবহতার কথা ফিকির করা।

৮১. তাহাজ্জুদ সালাত ও রাত্রিজাগরণ আল্লাহ তা‘আলার রহমত আনয়ন করে। তাই আল্লাহ তা‘আলার রহমতপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৮২. রাতে জাগিয়ে দেয়ার মতো নির্ভরযোগ্য কোনো লোককে নির্দিষ্ট করা।

৮৩. বুযুর্গানে কেরাম তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারলে আনন্দিত হতেন এবং ছুটে গেলে মারাত্মক ব্যথিত হতেন। আমাদের মধ্যেও এই অভ্যাস গড়ে তোলা।

৮৪. নিয়মিত ও দায়েমীভাবে রাতজাগরণের চেষ্টা করা।

৮৫. কেয়ামত দিবস এবং এই দিনের ভয়াবহতার কথা স্মরণে রাখা।

৮৬. প্রথমে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাতের মাধ্যমে সালাত শুরু করা।

৮৭. রাতের শেষভাগের সময়গুলোর মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করার চেষ্টা করা।

৮৮. তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করলে শারীরিক বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই শারীরিক সুস্থতার নেয়ামত লাভের জন্য তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত হওয়া।

৮৯. ক্রমান্বয়ে রাকাতের সংখ্যা এবং দীর্ঘ কিয়ামের দিকে অগ্রসর হওয়া।

৯০. পূর্বসূরী পুণ্যবানরা অসুস্থ অবস্থাতেও তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। এসব ঘটনা থেকে অনুপ্রেরণা হাসিল করা।

৯১. রাতের নামাযীদের কেরাত, দু'আ, দরূদ ইত্যাদি ফেরেশতারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। তাই নিজেও এই সৌভাগ্যের অংশীদার হওয়া।

৯২. তাহাজ্জুদ সালাত মূলত ইখলাস ও আল্লাহভক্তির প্রশিক্ষণ। তাই এই দুটি গুণ হাসিলের স্বার্থে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৯৩. নেককারগণ তাদের স্ত্রী, সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য খুবই অনুপ্রাণিত করতেন। সে সব ঘটনা থেকেও দীক্ষা নেয়া।

৯৪. তাহাজ্জুদ সালাত এত গুরুত্বপূর্ণ সালাত যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও এই আমলের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই পূর্ববর্তী উম্মতের

আমলের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অধিকহারে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৯৫. সালাত অবস্থায় এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাতে তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও ঘুমের ভাব দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯৬. সালফে সালেহীনগণ কীভাবে নিজেদের আদরের ও প্রিয় সন্তানদেরকে রাতে জাগিয়ে তুলে তাহাজ্জুদের জায়সালাতে দাঁড় করিয়ে দিতেন, সেসব ইতিহাস পাঠ করে সে অনুযায়ী তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার মাধ্যমে নিজেদেরকেও সেভাবে গড়ে তোলা।

৯৭. শেষ রাতে প্রাণীকুল আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে থাকে। সে সময় আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে নির্লজ্জতা প্রদর্শনী না করে তাদের সঙ্গে নিজেও আল্লাহ তা'আলার জিকির তথা তাহাজ্জুদ সালাতে লিপ্ত হওয়া।

৯৮. তাহাজ্জুদ সালাত আত্মিকব্যাধি ও অন্যান্য বিপদ দূর করে। আর নিঃসন্দেহ বস্তু দুটি অতি মূল্যবান। তাই এই নেয়ামত লাভ করার নেক নিয়তে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা।

৯৯. পূর্বসূরীগণ মেহমানদেরকেও তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য জাগ্রত করতেন! নিজেদের মধ্যেও এই মহৎগুণাবলী অর্জন করা।

১০০. সালাতের রুকু ও বসার মধ্যে সুষ্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখা।

১০১. রাত্রিজাগরণ উচ্চমর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে আত্মাকে প্রশিক্ষিত করার বড় একটা মাধ্যম।

১০২. পূর্বসূরীগণ তাদের শিষ্যদেরকে তাহাজ্জুদ সালাত ও রাত্রিজাগরণের ব্যাপারে খুব তাগিদ করতেন। তাদের অনুসরণ করত নিজেকেও তাহাজ্জুদের জন্য প্রস্তুত করা এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে থাকা।

১০৩. দিনের নফল সালাতের চাইতে রাতের সালাতের ফযীলত বেশি। তাই বেশি ফযীলতের সালাতের জন্য তাহাজ্জুদ আদায় ও রাত্রিজাগরণ করা।